লোক প্রশাসন সাময়িকী
ত্রয়োদশ সংখ্যা
জুন ১৯৯৯, আষাঢ় ১৪০৬

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুন ১৯৯৯, আষাঢ় ১৪০৬

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ সিকান্দার আলী মন্ডল
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কাজী মোঃ শামসুল আলম
কাজী হাসান ইমাম
কঙ্কা জামিল

সম্পাদক

মোঃ শফিকুল হক

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুন ১৯৯৯, আষাঢ় ১৪০৬

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক জার্ণাল

সম্পাদক ঃ মোঃ শফিকুল হক

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৪০৬

টেলিফোন	ঃ	৮৩১৭১৫-২০ (পিএবিএক্স)
টেলেক্স	ঃ	৬৩২২২৮ পিএটিসি বিজে
ফ্যাক্স	ঃ	৯৩৩২০১৬
ই-মেল	ঃ	বিপিএটিসি @ বাংলা. নেট
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
মূল্য	ঃ	পনের টাকা
মুদ্রণে	ঃ	ইছামতি অফসেট প্রেস ১/১ হাজীপাড়া, রামপুরা ঢাকা-১২১৯। ফোন ঃ ৪১৩৭৩৭

LOKPROSHASHON SAMOEEKY

Vol.13, June 1999, Ashar 1406

Quarterly Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre

Editor : Md. Shafiqul Haque

© Bangladesh Public Administration Training Centre 1406

Telephone	:	831715-20 (PABX)
Telex	:	632228 PATC BJ
Fax	:	9332016
E-Mail	:	bpatc @ bangla. net
BPATC Library	:	351.0005
Cover Design	:	Qazi Azad
Price	:	Taka Fifteen only

লোক প্রশাসন সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ত্রয়োদশ সংখ্যা
জুন ১৯৯৯, আষাঢ় ১৪০৬

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	বিপিএটিসি প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা : একটি ঘটনা সমীক্ষা কাজী হাসান ইমাম	১
২.	বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠ পর্যায়ে জন প্রশাসন প্রসঙ্গ ডঃ তোফায়েল আহমেদ	৩৭
৩.	অর্থ-ব্যবস্থার স্বরূপ এস, এম, আলী আক্কাস এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম	৭৯
৪.	Foreign Direct Investment in Bangladesh : An Analysis Khondoker Abdul Mottaleb	89
৫.	Managing Performance Challenges of Public Sector HRD Md. Shirajul Islam	109
৬.	Contracting Out in the Public Sector : Concepts and Issues Rizwan Khair	125
৭.	Empowerment of Women : Problems and Issues in the context of Bangladesh. Golam Mostakim	141
৮.	Women in Development in Global Perspective Ayesha Azim	165
৯.	Hill Tracts Peace Accord : An Analysis Kazi Mohammad Shamsul Alam	177

বিপিএটিসি প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা : একটি ঘটনা সমীক্ষা

কাজী হাসান ইমাম *

(পূর্ব প্রকাশের পর)

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, অনুষদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অধীনে বন্দোবস্তকৃত প্রশিক্ষণ, শিক্ষা-সফর ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধাগুলো সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয়নি, বিপিএটিসি'র কর্মকর্তা ছাড়াও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এমন অনেককে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে, যারা কোন কালেই বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন না এবং ফলত কেন্দ্রের অনুষদ উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে[২৪]। ফলাফল/প্রতিক্রিয়া পর্যায়ে কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ কতখানি অর্জিত হয়েছে তা নিম্নে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন মূল্যায়ন দলিলের অনুসরণে চিত্রায়িত করা হলো ঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যায়
(ক) পুর্বতন কোটা, নিপা, বিএএসসি-এ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে একই চত্ত্বরে স্থাপন করা, একীভূত ও সমন্বিত এ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি এবং একই সাথে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও যন্ত্রপাতিসহ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ ক্ষমতা উন্নয়ন।	(ক) সাবেক কোটা, নিপা ও বিএএসসিকে একত্রিত করে একই কর্তৃত্বে ও একই চত্ত্বরে স্থাপন করা হয়েছে[২৫]। এজন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোও সৃষ্টি করা হয়েছে, যার অনেক কিছু পূর্বতন প্রতিষ্ঠানগুলোতে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল[২৬]। একথা সত্য যে বিপিএটিসি সৃষ্টি হওয়ার ফলে উপর্যুক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিক সংখ্যক কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়েছে[২৭]। প্রয়োজনের আলোকে কিছু আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতিও সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু প্রকল্পের

* উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি

২৪ হোসেন, সৈয়দ মকবুল ও অন্যান্য. ঃ সাভারস্থ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডিজাইন, নির্মাণ ও ব্যয় সম্পর্কে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৯১, পৃ. ১১-১২।

২৫ Opcit, P. 3.

২৬ Anisuzzaman, M. et al. : *Bangladesh Public Administration Training Cenre Phase-II Project : An Evaluation*. BPATC, Savar, Dhaka,1990, p. 7.

২৭ Opcit, P. 3

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যায়
	এ উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়নে বিষয় উপেক্ষিত হয়েছে। উদাহরণত এ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে একই কর্তৃত্বে একই চত্বরে স্থাপন করলেও প্রতিষ্ঠান তিনটির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে বিরাজমান "ইজমিক দ্বান্দ্বিকতা" নিরসনের কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রের কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ফলে ভৌত অগ্রগতির দৃষ্টিকোণে উদ্দেশ্যটি পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হলেও গুণগত বিচারে তা সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয়নি।
(খ) গ্রন্থাগার সুবিধাদি বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়ন, পাঠ্যসূচি সময়োপযোগী-করণ, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনুষদ উন্নয়ন, ইত্যাদির মাধ্যমে বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণের গুণগতমান বৃদ্ধি।	(খ) কেন্দ্রে একটি আধুনিক ও বিশালাকার গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থাগারটির পুস্তক-সাময়িকী মিলে প্রায় ৮০ হাজার সংগ্রহ রয়েছে[২৮]। লোক-প্রশাসনের ওপর দেশে এটিই সবচেয়ে বৃহৎগ্রন্থাগার হিসেবে বিবেচিত। প্রশিক্ষণ সামগ্রীর উন্নয়নের বিষয়টি আপেক্ষিক এবং এটি একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। তবে এর গুণগত মান আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও বর্তমানের আঙ্গিকে তা পর্যাপ্ত মান সম্পন্ন নয় বলে অনেকে মনে করেন। পাঠ্যসূচি সময়োপযোগীকরণের বিষয়টি এখনো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। এজন্য যে জিনিষটি সর্বাগে হলো সময়োপেযোগী প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ। এ দায়িত্বটি মূলত জাতীয় প্রশিক্ষণ পরিষদের। সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ-চাহিদা নিরূপণের ব্যর্থতার কারণে পাঠ্যসূচি সময়োপযোগীকরণের বিষয়টি প্রভাবিত হয়েছে। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে স্বল্প-পরিসরে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের প্রয়াস নেয়া হলেও

২৮ opcit, p.60.

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যায়
	প্রয়োজনীয় আর্থিক আনুকূল্যের অভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়নি। পাঠ্যসূচিতে ব্যবহারিক অধিবেশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিভিন্ন কোর্সে, বিশেষত বুনিয়াদি পাঠক্রমের বিভিন্ন মডিউলের জন্য একটি প্রশিক্ষণ সামগ্রী তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ উপকরণের উন্নয়নের প্রক্রিয়াও অব্যাহত আছে। অনুষদ উন্নয়নের বিষয়টি দারুনভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়েছে : এ সমস্ত কারণে কেন্দ্রের সামগ্রিক প্রশিক্ষণের যথার্থ গুণগত মান অর্জনের বিষয়টি অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। তবে ভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠান থেকে বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণের সংখ্যাগত ও গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটেছে বলে অনেকে শুধুমাত্র প্রকল্পের ইন-বিল্ট-ম্যাকাজিমের ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সরকারের নীতিমালা, পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের কার্যক্রমের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং প্রকল্পটির ফলপ্রসূতা বিশ্লেষণে এসব বিষয়ও বিশেষভাবে বিবেচনায় আনার প্রয়োজন রয়েছে।
(গ) পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, পুরানো প্রশিক্ষণ উপকরণ ও পদ্ধতির উন্নয়ন, প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণে একটি সিষ্টেম এ্যাপ্রোচ চালু করা।	(গ) প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, প্রশিক্ষণ উপকরণ ও পদ্ধতির উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের একটি অন্যতম সবল দিক। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিটি পাঠক্রম মূল্যায়নের ফলাবর্তন-তথ্য পরবর্তী পাঠক্রম প্রণয়নার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এটি কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় একটি সিষ্টেমে পরিণত হয়েছে। তবে প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়নে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে, বিশেষত

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যায়
	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা এবং পাঠক্রমের মেয়াদ। এছাড়া সরকারের উন্নয়ন নীতিমালা ও পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হলে অথবা সমকালীন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের বা অনুবিভাগের অনুষদ সদস্যদের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের পাঠ্যসূচি'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়াটিও কেন্দ্রের প্রশিক্ষণে একটি সিষ্টেম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং এভাবেই কেন্দ্রের পাঠক্রমসমূহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন ও সংশোধন ঘটছে।
(ঘ) কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার্থে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা।	(ঘ) বর্তমানে একজন রেক্টরের নেতৃত্বে ৫টি একাডেমিক ডিভিশন ও একটি প্রশাসনিক দপ্তর পরিচালিত হচ্ছে, কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা ৪৫৩ জন। তবে মুক্তবাজার অর্থনীতির জটিল যুগের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত জনপ্রশাসক সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।
(ঙ) কেন্দ্রের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য ব্যবস্থাপনা সুবিধার উন্নয়ন।	(ঙ) সুষ্ঠুভাবে কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনার্থে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। সময়ের প্রেক্ষাপটে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলেও প্রকল্পের এ উদ্দেশটি মোটামুটি যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।
(চ) প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের ওপর কেন্দ্র কর্তৃক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গবেষণা পরিচালনা করা।	(চ) প্রশিক্ষণের গুণগত মান ও পাঠ্যসূচি উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র এককভাবে এবং বিভিন্ন সময়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্রয়োজনের আলোকে বিবিধ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করেছে ও করছে; পাঠ্যসূচির প্রয়োজনে ঘটনা-সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। এমনকি সরকারের নীতি প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এসব গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশমালা সরকারের কাছে প্রেরণ করা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যায়
	হয়েছে[২৯]। প্রকল্পের আওতায় বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে কারিকুলাম প্রণয়ন ও উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ১৯৮৬-৯৩ সময়ে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট ৫৮টি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে[৩০]। এছাড়া ১৯৮৪-৯০ পর্যন্ত ২৫টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তবে আমাদের সর্বজনীন দেশীয় সংস্কৃতিতে গবেষণালব্ধ ফলাফলকে বাস্তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন বহুমুখী প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে রেডিমেড (?) গবেষকদের অশুভ পদচারণায় গবেষণার গুণগত মান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ায়।
(ছ) দেশীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় এবং তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে বাংলাদেশের লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিপিএটিসি'কে একটি "অনুপম কেন্দ্র" হিসেবে উন্নীত করা।	(ছ) প্রকল্পের আওতায় এবং প্রকল্প বহির্ভূত উভয়ভাবেই কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক লোক-প্রশাসন প্রতিষ্ঠান (আইপিএ), আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, ইডিআই (বিশ্বব্যাংক), এপিডিসি, ও অন্যান্য অনেক বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে কেন্দ্রের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে[৩১]। দেশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও কেন্দ্রের সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সামগ্রিক দিক বিচারে কেন্দ্র বাংলাদেশের লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি একক ও শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি "অনুপম কেন্দ্র" হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন-প্রয়াস অব্যাহত আছে।

২৯ Anisuzzaman, M. et al. : *Bangladesh Public Administration Training Center Phase-II Project : An Evaluation*. BPATC, Saver, Dhaka, 1990, p. 55-56.

৩০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ঃ বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায় (সংশোধিত) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ–৩।

৩১ Anisuzzaman, M. et al. : *Bangladesh Public Administration Training Centre Phase-II Project : An Evaluation. BPATC, Savar, Dhaka. 1990, p. 97-101. এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ঃ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায় (সংশোধিত) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন*, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ–৩।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্যের বিপরীতে সাফল্য অর্জনের সর্বমোট ফলাফল হিসেবে বিপিএটিসি প্রতিবছর বুনিয়াদি, এসিএডি, সিনিয়র স্টাফ কোর্সসহ ১৭ ধরনের ২৬টি পাঠক্রম বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হচ্ছে[৩২] এবং এরই ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত কেন্দ্র ৩৩৮টি পাঠক্রম, ৬৫টি সেমিনারের মাধ্যমে যথাক্রমে ১৩,৪৯৪ ও ৩,১৬৮ জন এবং সর্বমোট ১৬,৬৬২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম হয়েছে[৩৩]। যদিও বিপিএটিসি স্থাপনকালের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিশেষ সুখপ্রদ হয়নি, তথাপি পরিকল্পিত উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যের আলোকে বিপিএটিসি'কে একটি ফলপ্রসূ প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

২.২.১ বিপিএটিসি পরিচালিত বিভিন্ন পাঠক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

সমন্বিত প্রশিক্ষণ ধারণা ছাড়াও বিপিএটিসি দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি/উন্নয়ন। যদিও প্রকল্পটি জুন, ১৯৯০-তে শেষ হয়, তথাপি ১৯৮৪ সাল থেকেই কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। জন্মলগ্ন থেকেই কেন্দ্রে ভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠানত্রয় কর্তৃক পরিচালিত বুনিয়াদি (কোটা'তে), এসিএডি (নিপা'তে) এবং সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স (বিএএসসি'তে) ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের স্বল্প-মেয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। তবে সংখ্যাগত দিক থেকে স্থিরীকৃত প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্পটি কতখানি সফল হয়েছে তা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চলতি সমীক্ষায় মূলত কেন্দ্রের কর্মজীবন উন্নয়ন পাঠক্রমসমূহকেই (বুনিয়াদি, এসিএডি ও সিনিয়র স্টাফ কোর্স) বিবেচনায় আনা হয়েছে। পাঠক্রমভিত্তিক আলোচনার পূর্বে একথা স্মর্তব্য যে, প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের যে প্রশিক্ষণ লক্ষমাত্রা স্থির করা হয়েছিল, তা বিভিন্ন সময় পরিবর্তন করা হয় এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কেন্দ্রের সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধিত কলেবরে নতুন করে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। আর একটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচ্য যে, সংখ্যাগত দিক থেকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন শুধুমাত্র বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ ক্ষমতার ওপরেই নির্ভরশীল নয়, বরং মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান ও মনোনীত প্রশিক্ষণার্থীদের কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে যোগদানের নিশ্চয়তা বিধানের ওপরও নির্ভরশীল।

---

৩২ Opcit

৩৩ পিপিআর অনুবিভাগ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান।

ক. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

সাবেক কোটায় ৬টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে সর্বমোট ৮৪০ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। কোটা'র বার্ষিক গড় প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৫ জন। শুরু থেকে জুন ১৯৯০ পর্যন্ত বিপিএটিসি চার মাসের সাতটি বুনিয়াদি এবং দুই মাসের ১১টি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম পরিচালনা করে, যাতে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ১০০১ ও ২০৫৫ জন, মোট ৩০৫৬ জন। অর্থাৎ এসময়ে কেন্দ্র প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৪৩৭ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ সংখ্যাটি কোটা'তে অনুষ্ঠিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের বার্ষিক গড় প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা থেকে অনেক বেশি এবং বিপিএটিসি দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের পিপি'তে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থেকেও বেশি। অর্থাৎ বাস্তবায়ন পর্যায়েও প্রকল্পের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে (সারণি-৩)। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পে পিপি'তে স্থিরীকৃত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০০ জন। প্রকল্পের ভৌত সুবিধাদি পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি হওয়ার আগেই কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ পাঠক্রম পরিচালনার কাজ শুরু করা হয়। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৮৫ সালের জুলাই পর্যন্ত বৎসরে ১২০ জনের লক্ষ্যমাত্রা (প্রতি পাঠক্রমে ৬০জন) স্থির করা হয় এবং তা অর্জিতও হয়। ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে লক্ষ্যমাত্রা পুনরায় প্রতি পাঠক্রমে ২০০ জন অর্থাৎ বৎসরে ৪০০ জনে উন্নীত করা হয়। কিন্তু পরিপূর্ণরূপে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি হওয়ার পূর্বেই এভাবে হঠাৎ করে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিম্নগামী হয়। ফলে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা পুনরায় প্রতি পাঠক্রমে ১৪০ জন অর্থাৎ বৎসরে ২৮০'তে নির্ধারণ করা হয়। এভাবে বিভিন্ন সময়ে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যাগত লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করা হয়। যাহোক, এক্ষেত্রে পিপি'তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় আনলে তা সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয়েছে বলা যায়। অন্যদিকে উপর্যুক্ত সারণি থেকে এটাও স্পষ্ট যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নোত্তরকালে প্রতি বৎসর আরো বেশি সংখ্যক (৪৩৩জন) প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তবায়নোত্তরকালে প্রকল্পের অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য এর পাশাপাশি একথাও স্মর্তব্য যে, বুনিয়াদি পাঠক্রমে মন্ত্রণালয় থেকে যে সংখ্যক কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়, তাদের সকলের পাঠক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়টি কার্যত এখনো সুনিশ্চিত করা হয়নি।

সারণি-৩ ঃ কোটা-বিপিএটিসি'র তুলনামূলক প্রশিক্ষণ চিত্র

পরিচালিত প্রশিক্ষণ-তথ্য	কোটা'তে	বিপিএটিসি'তে	
		জুন ৯০ পর্যন্ত	জুন ৯৭ পর্যন্ত
বার্ষিক গড় পাঠক্রম সংখ্যা	০.৮৬	২.৫৭	২.৬৪
বার্ষিক গড় প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	৫৫.০০	৪৩৭.০০	৪৪৩.০০

খ. এসিএডি কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

সাবেক নিপা'তে বৎসরে গড়ে ১.৫টি এসিএডি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম পরিচালিত হতো, যেখানে প্রতি পাঠক্রমে গড় প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ২০.৪৪ জন। অন্যদিকে, নিম্নের সারণি থেকে দেখা যায় যে, নিপা'র বার্ষিক গড় প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০.৬৬ জন। বিপিএটিসি দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্প বাস্তবায়নকালে জুন, ১৯৯০ পর্যন্ত এবং বাস্তবায়নোত্তরকালে জুন, ১৯৯৭ পর্যন্ত এ সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪ ও ৪১.৩১-এ উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ সাবেক নিপা থেকে সংখ্যাগত দিক বিচারে বিপিএটিসি'র এসিএডি কোর্সের প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের পিপি'তে এ পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল ৩৪ জনে[৩৪]। অর্থাৎ এদিক থেকেও প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তরকালের লক্ষ্যমাত্রা অধিক হারে অর্জিত হয়েছে (সারণি-৪)।

সারণি-৪ নিপা-বিপিএটিসি'র তুলনামূলক প্রশিক্ষণ চিত্র

পরিচালিত প্রশিক্ষণ-তথ্য	নিপা'তে	বিপিএটিসি'তে	
		জুন, ৯০ পর্যন্ত	জুন, ৯৭ পর্যন্ত
বার্ষিক গড় পাঠক্রম সংখ্যা	১.৫০	১.৬৭	২.০৮
বার্ষিক গড় প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	৩০.৬৬	৩৪.০০	৪১.৩১

৩৪ Anisuzzaman, M. et. al. : *Bangladesh Public Administration Training Centre Phase-II Project : An Evaluation*. BPATC, Savar, Dhaka, 1990, p. 30.

গ. সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

সাবেক বিএএসসি'তে "প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা" নামে পরিচালিত এ পর্যায়ের পাঠক্রমে বার্ষিক গড়ে ৩৭.৭১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হ'ত, যেখানে প্রতি পাঠক্রমে গড় প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮.৮৬ জন। দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের পিপি'তে প্রতি বৎসরে দুটি পাঠক্রম এবং প্রতি পাঠক্রমে ৩০ জন অর্থাৎ বৎসরে মোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর কাল উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্র কর্তৃক স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় মাত্র অর্ধেক অর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে সাবেক বিএএএসসি'তে প্রতি বৎসর যে সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হ'ত, বিপিএটিসি'র অর্জিত হার তার তুলনায় কিছুটা কম (সারণি-৫)। একথা সত্য যে, লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষমতা বিপিএটিসি'র রয়েছে। কিন্তু প্রতি বৎসর প্রায়শই লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক কম সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী এ পাঠক্রমে অংশ নিয়ে থাকে। বিভিন্ন মূল্যায়নে দেখা গেছে, এ পাঠক্রমে মনোনীত হওয়ার পরও এ পর্যায়ের সিনিয়র কর্মকর্তাদের পাঠক্রমে যোগদান করা-না করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থার নির্লিপ্ততাই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার প্রধান কারণ[৩৫]।

সারণি-৫ ঃ বিএএসসি-বিপিএটিসি'র তুলনামূলক প্রশিক্ষণ চিত্র

পরিচালিত প্রশিক্ষণ-তথ্য	বিএএসসি'তে	বিপিএটিসি'তে	
		জুন ৯০ পর্যন্ত	জুন ৯৭ পর্যন্ত
বার্ষিক গড় পাঠক্রম সংখ্যা	২.০০	১.৬৭	১.৮৫
বার্ষিক গড় প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	৩৭.৭১	৩০.৫০	৩১.০০

ঘ. অন্যান্য পাঠক্রম/সামগ্রিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বিভিন্ন পাঠক্রমের জন্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি'তে স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রা নয়) সকল সময়ে একইভাবে অর্জিত হয়নি। অনেক সময় কোন কোন পাঠক্রমে লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশি সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণে অংশ নেয় [৩৬]।

৩৫ ibid, p. 37.

৩৬ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ *বার্ষিক প্রতিবেদন*, ১৯৯৫-৯৬ সাভার, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ-২০।

সারণি-৬ ঃ বিপিএটিসি আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের তুলনামুলক বিবরণী (১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত)

সাল	সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার (%)	অর্জিত জনমাস
ক.কোর্স সম্পর্কিত					
১৯৮৪-৮৫	১৮	৭৪৯	৭১১	৯৪.৯৩	১১৫৫.৭৫
১৯৮৫-৮৬	১৮	৮৫৯	৭২৪	৮৪.২৪	২০৫৭.১০
১৯৮৬-৮৭	২৩	১০৯৭	১০০৭	৯১.৮০	২০৯৩.০০
১৯৮৭-৮৮	৩১	১৬০২	১৩৮৮	৮৬.৬৪	২১৩৩.৭০
১৯৮৮-৮৯	১৫	১২০১	১০২৭	৮৫.৫১	১৯১৩.৭৫
১৯৮৯-৯০	২১	১২৯৬	১১৮২	৯১২০	২০৬২.২৮
১৯৯০-৯১	৩০	১৪০০	১১৪২	৮১.৫৭	১৮৩৬.৮৩
১৯৯১-৯২	২৭	১৪৯৮	১২২৮	৮১.৯৮	২৩০৬.৬৯
১৯৯২-৯৩	২৫	৯৭০	৭৫১	৭৭.৪২	১৯৬২.৪৫
১৯৯৩-৯৪	২৪	১২৯৭	৮৬৭	৬৬.৮৫	১৫০৮.৮৪
১৯৯৪-৯৫	২২	৯১৫	৭৪৩	৮১.২০	১৫৪০.৬৪
১৯৯৫-৯৬	২৫	১০৫৭	৮৪৭	৮০.১৩	১৭০৩.৮০
মোট	২৭৯	১৩৯৪১	১১৬১৭	৮৩.৬২	২২২৭৮.৮৩

(সারণি চলমান)

চলমান-২

সাল	সংখ্যা	প্রকৃত অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	অর্জিত জনমাস
খ. সেমিনার সম্পর্কিত			
১৯৮৪-৮৫	৩	১১০	১০.০০
১৯৮৫-৮৬	৪	৩০২	১৭.৯৭
১৯৮৬-৮৭	৭	৩১০	১৭.৫৩
১৯৮৭-৮৮	৭	২৭৩	১১.৯০
১৯৮৮-৮৯	১	১৫	২০.০
১৯৮৯-৯০	২	৬৭	৭.০০
১৯৯০-৯১	২	৮০	৯.৬৭
১৯৯১-৯২	৪	১৪৩	৮.৪৯
১৯৯২-৯৩	৫	২৮২	৯.৩৫
১৯৯৩-৯৪	১২	৭৯১	২৬.৮৭
১৯৯৪-৯৫	৩	১৯৫	৬.৩৩
১৯৯৫-৯৬	৭	২৪৮	১৯.১৬
মোট	৫৭	২৮১৬	১৪৬.৭৭

উৎস ঃ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : বার্ষিক প্রতিবেদন-১৯৯৫-৯৬, সাভার, ঢাকা পৃ-২১।

আবার কখনো কখনো লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জিত হয়না। তবে প্রকল্পের উদ্দেশ্যগত দিক থেকে কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত তিনটি মূল প্রশিক্ষণ পাঠক্রম বাদে বাকী ২০-২২টি বিভিন্ন ধরনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ পাঠক্রম পরিচালনার বিষয়টি অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আবার বার্ষিক প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণেও কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সব সময়ে স্থির নন। অর্থাৎ বার্ষিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে কেন্দ্র সতত পরিবর্তনশীল (সারণি-৬)। তবে সামগ্রিক দিক বিচারে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা যথার্থই অর্জিত হয়েছে এবং হচ্ছে বলা যায়।

২.২.২ অনুষদ উন্নয়ন ও তার মাধ্যমে প্রাপ্ত সেবা সুবিধাদি

অনুষদ উন্নয়ন একটি অব্যাহত এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সাধারণত অনুষদ উন্নয়নের বিষয়টি চারভাবে সম্পন্ন হতে পারে ঃ (১) অনুষদের নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে, (২) উর্ধ্বতন অনুষদদের নিবিড় তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যার মাধ্যমে, (৩) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং (৪) বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

নিজস্ব প্রচেষ্টায় আত্ম-উন্নয়ন/অনুষদ উন্নয়নের বিষয়টি সর্বজনীন হিসেবে বিবেচিত। কেন্দ্রের বেশ কিছু কনিষ্ঠ ও মধ্য পর্যায়ের অনুষদের মধ্যে এ প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। উর্ধ্বতন অনুষদদের নিবিড় তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যায় কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী অনুষদ গড়ে ওঠার অবকাশ ছিল। কেন্দ্রের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৮৩-৮৮ পর্যন্ত এ ধারাটি লক্ষ্যণীয় ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এ ধারায় ভাটা পড়ে। এ জন্য প্রশিক্ষণের প্রতি প্রশাসন যন্ত্রের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তাদের পদায়নের ক্ষেত্রে প্রার্থী বিবেচনার ধরন ইত্যাদি বিশেষভাবে দায়ী। ফলে কেন্দ্রে অনুষদ উন্নয়নে কোন "তত্ত্বাবধান/পরিচর্যা" সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, যেমন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, বুনিয়াদি, এসিএডি ইত্যাদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কেন্দ্রের অনুষদ উন্নয়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। তবে কেন্দ্রের নিজস্ব অনুষদদের জন্য এ সুবিধা খুবই সীমিত ও অপর্যাপ্ত।

সবশেষে, অনুষদ উন্নয়নের একটি বিশেষ মাধ্যম হচ্ছে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ। দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের বিনিয়োগ-ব্যয় (সারণি-২) বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রতিষ্ঠানটির সফ্‌ট-ওয়্যার উন্নয়ন থেকে হার্ড-ওয়্যার উন্নয়নের দিকে বেশি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রের তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পে অনুষদ উন্নয়নের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে। কেন্দ্রের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সময়ে টিএপিপি'র মাধ্যমে অনুষদ উন্নয়ন/ফেলোশীপ সংক্রান্ত প্রস্তাব সরকারের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হলেও তা অদ্যাবধি আলোর মুখ

দেখেনি এবং অদূর ভবিষ্যতে দেখবে এমনটিও আশা করা যায় না। দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় লোক-প্রশাসন, উন্নয়ন অর্থনীতি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সংগঠন উন্নয়ন, নীতি বিশ্লেষণ, আর্থিক বিশ্লেষণ, সিষ্টেম এনালাইসিস, কর্মী প্রশাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পেশাগত অনুষদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আমেরিকাভিত্তিক ১৩টি এম, এস, কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এর মধ্যে ৬টি কর্মসূচিতে কেন্দ্রের নিজস্ব কর্মকর্তা এবং ৫টি কর্মসূচিতে প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়। নিজস্ব অনুষদদের ৬ জনের মধ্যে ২ জন প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে আসেননি, একজন ফিরে এলেও পরবর্তীতে অবৈধভাবে কেন্দ্র ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন; অপর তিনজন এখনো কেন্দ্রে কর্মরত আছেন এবং তাঁদের নিজস্ব ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে কেন্দ্রকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। প্রেষণে নিযুক্ত উপর্যুক্ত ৫জন কর্মকর্তার সকলেই যোগদানের ২-৫ বছরের মধ্যে কেন্দ্র ত্যাগ করেছেন। বাকী দু'টি এম, এস, কর্মসূচি কেন্দ্র কর্তৃক ব্যবহৃত হয়নি। এছাড়া স্বল্প-মেয়াদী কিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও কেন্দ্রের কাছ থেকে বেহাত হয়ে গেছে।

প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নিয়ে যাঁরা কেন্দ্রে যোগদান করেছিলেন, কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের ধারা-প্রকৃতি অনুধাবনে তাঁদের প্রায় ৬-১২ মাস সময় অতিবাহিত হয়। এরপর বেশ দক্ষতার সাথে তাঁরা প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায়ও তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে। প্রশিক্ষণভার বহনের হার (বিশেষত মধ্য সোপান কোর্স ও অন্যান্য সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম) বৃদ্ধি পেতে থাকে (সারণি-৭)। তবে ৮৮'র শেষভাগে বেশ কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ১৯৯১-৯২পরবর্তীতে খুব দ্রুত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপর্যুক্ত কর্মকর্তাদের অনেকের একত্রে কেন্দ্র ত্যাগ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণভার বহনের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা শূন্যতার সৃষ্টি করে। তবে এ অবস্থা খুব স্থায়ী ছিল না। কেননা, প্রকল্প বহির্ভূত কর্মসূচির আওতায় বিদেশে প্রশিক্ষণ শেষে ক'জন কর্মকর্তা ইতোমধ্যে কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করেন এবং প্রশিক্ষণভার বহনের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর অবদান রাখতে থাকেন। তবে তাঁদের অবদান মূলত বুনিয়াদি, এসিএডিসহ সংক্ষিপ্ত পাঠক্রমসমূহের মধ্যে সীমিত থাকে। এজন্য সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সে অতিথি বক্তার ওপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় (সারণি-৭)। সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সুবিধা বিতরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের নিজস্ব অনুষদদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়নি। ফলে একটি বিশেষ সময়ের জন্য কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কিছুটা ভাল হলেও স্থায়ীভাবে কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী নিজস্ব অনুষদ গড়ে ওঠেনি এবং কেন্দ্র দীর্ঘমেয়াদী অনুষদ-সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সারণি-৭ ঃ বিভিন্ন পাঠক্রমে অনুষদ ও অতিথি বক্তাদের গড় প্রশিক্ষণভার বহনের তুলনামুলক বিবরণী, ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত

	প্রশিক্ষণভার বহনের পরিমাণ (%)											
	অনুষদ বক্তা						অতিথি বক্তা					
	৮৪-৮৫	৮৫-৮৬	৮৬-৮৭	৮৭-৮৮	৮৮-৮৯	৮৯-৯০	৮৪-৮৫	৮৫-৮৬	৮৬-৮৭	৮৭-৮৮	৮৮-৮৯	৮৯-৯০
বুনিয়াদি পাঠক্রম	–	৭৬	৭৮	৮১	৭৬	৮৬	–	২৪	২২	১৯	২৪	১৪
মধ্যসোপান পাঠক্রম	–	৮৫	৬৬	৬১	৭৬	৭০	–	১৫	৩৪	৩৯	২৪	৩০
উচ্চতর সোপান পাঠক্রম	–	৫৯	৬০	৬০	৩৩	১৭	–	৪১	৪০	৪০	৬৭	৮৩
অন্যান্য পাঠক্রম	–	৫৯	৬৯	৬৬	৫২	৮৬	–	৪১	৩১	৩৪	৪৮	১৪
গড়	–	৭০	৬৮	৬৭	৫৯	৬৫	–	৩০	৩২	৩৩	৪১	৩৫

(চলমান পাতা-২)

প্রশিক্ষণ ভার বহনের পরিমাণ (%)												
	অনুষদ বক্তা						অতিথি বক্তা					
	৯০-৯১	৯১-৯২	৯২-৯৩	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯০-৯১	৯১-৯২	৯২-৯৩	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬
বুনিয়াদি পাঠক্রম	৮৮	৮৩	৭৮	৭২	৭৫	৮১	১২	১৭	২২	২৮	২৫	১৯
মধ্যসোপান পাঠক্রম	৫৯	৪৬	৫৭	৫৩	৫৮	৫৪	৪১	৫৪	৪৩	৪৭	৪২	৪৬
উচ্চতর সোপান পাঠক্রম	৩৩	৩৪	২৪	৩২	১৭	৫৮	৬৭	৬৬	৭৬	৬৮	৮৩	৪২
অন্যান্য পাঠক্রম	৭৫	৬৮	৭১	৬৯	৪২	৭১	২৫	৩২	২৯	৩১	৫৮	২৯
সর্বমোট গড়	৬৪	৫৮	৫৮	৫৭	৪৮	৬৬	৩৬	৪২	৪২	৪৩	৫২	৩৪

উৎস ঃ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ বার্ষিক প্রতিবেদন-১৯৯৫-৯৬ সাভার, ঢাকা, পৃ-৩৭ ও বার্ষিক প্রতিবেদন-১৯৮৯-৯০, সাভার, ঢাকা, পৃ-২৫

২.৩ প্রকল্পের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়ন

জনপ্রশাসনকে একটি সমন্বিত রূপদান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যাবলীকে সামনে রেখে আশির দশকের গোড়ার দিকে পূর্বোল্লিখিত তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে বিপিএটিসি সৃষ্টি করা হয়। প্রথমত, বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রশাসকদের একটি সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা[৩৭]। কেন্দ্রে বুনিয়াদি, মধ্যসোপান ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের পর্যায়ক্রমিক ধাপের সমন্বয় ঘটানোর মাধ্যমে এ উদ্দেশ্যটি যথার্থভাবে প্রতিপালিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, তাত্ত্বিক ও মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনুষদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ-শ্রেণীর (*high-breed*) প্রশিক্ষণ সম্ভরণ (*input*) সৃষ্টি করা। ধারণা করা হয়েছিল যে, ভূতপূর্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে আগত অনুষদ ছাড়াও কেন্দ্রে সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুদক্ষ তাত্ত্বিক হিসেবে গড়ে তোলা হবে এবং আনুপাতিক হারে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জনপ্রশাসকদেরকে কেন্দ্রের অনুষদ হিসেবে প্রেষণে নিয়োগ করা হবে। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর-অন্তর প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ মাঠপর্যায়ে ফিরে যাবেন এবং নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে আবার কেন্দ্রে ফিরে আসবেন। এতে এ দু'য়ের সমন্বয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকের সর্বোৎকৃষ্ট মিশ্রণ ঘটিয়ে জনপ্রশাসকদেরকে একটি উচ্চ-শ্রেণীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। ফলে জনপ্রশাসনের সর্বস্তরে একটি অভূতপূর্ব দক্ষতা-উৎপাদ সৃষ্টি হবে। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। ভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠান থেকে যাদেরকে এখানে টেনে আনা হয়েছে, তাদের ভেতরকার 'ইজমিক দ্বান্দ্বিকতা' নিরসনের কোন ম্যাকানিজম না থাকায় এবং নতুন আঙ্গিকে তাদের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষিত না হওয়ায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায়। বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বিপিএটিসি'কে প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ডাম্পিংগ্রাউন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। দক্ষ জনপ্রশাসকদের মধ্যে কখনো যাঁরা এসেছেন, কোন না কোন কারণে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে ঠেলে পাঠানো হয়েছে। অনেকে দীর্ঘকাল ক্রমাগত অবস্থানের ফলে তাঁদের অভিজ্ঞতার সময়োপযোগিতা হারিয়েছেন। একটি শক্তিশালী নিজস্ব অনুষদ তৈরির বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

---

৩৭ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: *বার্ষিক প্রতিবেদন*, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৫-৯৬,

প্রকল্পের আওতায় অনুষদ উন্নয়নে যে সকল ফেলোশীপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার বেশিরভাগই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার ভাগ-বাটোয়ারার ''উপযোগ'' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অন্যদিকে প্রকল্প বহির্ভূত ফেলোশীপ কর্মসূচিগুলোর বেশিরভাগই কেন্দ্রস্থ 'উড়ন্ত পাখির মৎস্য শিকারে' পরিণত হয়েছে। ফলে উচ্চ শ্রেণীর প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি নিতান্তই কল্পনায় পর্যবসিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, আন্তঃ ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্যে সহমর্মিতা এবং আন্ত-স্তরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সুহৃদ সংযোগ সৃষ্টি করা, যাতে এ সহমর্মিতা ও সংযোগ সৃষ্টির কারণে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। একথা সত্য যে, বিপিএটিসি'র এ প্রশিক্ষণ পরিবেশের কারণে বিভিন্ন পাঠক্রমের কর্মকর্তাদের মধ্যে আন্তর্ব্যক্তিক, আন্তক্যাডার ও সামষ্টিক সহমর্মিতা ও সংযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে সরকারের বিভিন্ন কাজও অনেকাংশে গতিশীলতা পাচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়টি বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে স্তরিক সীমাবদ্ধতায় আটকে থাকছে[৩৮]। একই সময়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অবস্থান করলেও আন্ত-স্তরিক সহমর্মিতা ও সংযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে সমন্বিত প্রশিক্ষণের এ অনিবার্য উপজাত *(by-product)* থেকে জন প্রশাসন তথা জাতি বঞ্চিত হচ্ছে।

চতুর্থত, মডিউলার পদ্ধতির প্রশিক্ষণের প্রবর্তন। ইউএনডিপি'র অর্থায়নে পরিচালিত প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষায় বিপিএটিসি'র ভৌত সুবিধাদি (কোটা, নিপা, বিএএসসি) উন্মুক্ত *(open ended)* উপ-অবয়ব পদ্ধতিতে (modular concept) গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়েছিল, যাতে প্রকৃত প্রয়োজনের নিরিখে ভবিষ্যতে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ দায়িত্বে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানকে মডিউল বা উপ-অবয়ব হিসেবে বিপিএটিসি'র মূল অবকাঠামোতে সংযুক্ত করা যায়[৩৯]। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিপিএটিসি স্থাপনে এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি।

সামগ্রিকভাবে বিপিএটিসি সৃষ্টির প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যাবলীকে বিবেচনায় আনলে দেখা যাবে, বেশিরভাগ উদ্দেশ্যই যথার্থ না হলেও মোটামুটিভাবে অর্জিত হয়েছে। আবার অনেক

---

৩৮ হোসেন, সৈয়দ মকবুল ও অন্যান্য.ঃ *সাভারস্থ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডিজাইন, নির্মাণ ও ব্যয় সম্পর্কে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৯১, পৃ-১১।

৩৯ ibid. পৃ-১০।

উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সুযোগও রয়েছে। সুতরাং এ আঙ্গিকে ফলপ্রসূতার নিবিড়তা কিছুটা কম হলেও বিপিএটিসি'কে একটি টেকসই প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

২.৪ কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সৃষ্টির পর্যায়

১৯৯০ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী, নানা সীমাবদ্ধতা স্বত্ত্বেও বিপিএটিসি'র প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে এবং তা উন্নয়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে[৪০]। তবে বর্তমান সমীক্ষার উত্তরদাতাদের মতে কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সৃষ্টির ধারাটি খুব আশাব্যঞ্জক নয়। এ চিত্রটি কেন্দ্রের প্রতি উত্তরদাতাদের হাতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। অথচ বিপিএটিসি সম্পর্কিত বিভিন্ন সমীক্ষা ও দলিলে এ ব্যাপারে ভিন্নতর চিত্র পাওয়া যায়। ভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠান থেকে কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি-৬)। ১৯৮৮-৯০ সময়কালে কেন্দ্রের বেশ কিছু অভিজ্ঞ ও দক্ষ উর্ধ্বতন এবং মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তার বদলীজনিত কারণে মধ্য-সোপান ও সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের অনুষদ প্রশিক্ষণভার বহনের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বেশ কিছুটা কমে গেলেও পরবর্তীতে এ পরিমাণ আবারো বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি-৭)। সহকারী পরিচালক ও উপ-পরিচালক পর্যায়ের কিছু দক্ষ প্রশিক্ষক সৃষ্টি হওয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণে অনুষদ প্রশিক্ষণভার বহনের পরিমাণ বেড়েছে প্রত্যাশিত হারে (সারণি ৭ ও ৮)।

---

৪০ Anisuzzaman, M. et. al. : *Bangladesh Public Administration Training Centre Phase-II Project : An Evaluation*. BPATC, Savar, Dhaka, 1990, p. iii.

সারণি -৮ ঃ বিভিন্ন পাঠক্রমে অনুষদ ও অতিথি বক্তাদের গড় প্রশিক্ষণভার বহনের তুলনামুলক বিবরণী, ১৯৯৫-৯৬

ক্রমিক	পাঠক্রমের নাম	প্রশিক্ষণভার বহনের পরিমাণ (%)	
		অতিথি বক্তা	অনুষদ বক্তা
১	পঞ্চদশ আচরণ ও শৃঙ্খলা পাঠক্রম	৮১	১৯
২	২৪তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন পাঠক্রম	৪৩	৫৭
৩	৩য় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পাঠক্রম	২০	৮০
৪	ষোড়শ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম	২০	৮০
৫	পঞ্চম অফিস ব্যবস্থাপনা পাঠক্রম	১২	৮৮
৬	চতুর্দশ সংক্ষিপ্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পাঠক্রম	০৬	৯৪
৭	পঞ্চম দারিদ্র দূরীকরণ পাঠক্রম	৭৫	২৫
৮	তৃতীয় উন্নয়ন প্রশাসন পাঠক্রম	৩১	৬৯
৯	সপ্তদশ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম	১৭	৮৩
১০	একাদশ মানবিক সম্পর্ক পাঠক্রম	১১	৮৯
১১	২২তম সিনিয়ার ষ্টাফ কোর্স	৪২	৫৮
১২	২৫তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন পাঠক্রম	৪৮	৫২
১৩	দশম আর্থবিধি ও পদ্ধতি পাঠক্রম	৬১	৩৯
১৪	একাদশ গবেষণা পদ্ধতি পাঠক্রম		১০০
১৫	দ্বিতীয় নীতি বিশ্লেষণ ও সমন্বয় পাঠক্রম	৭৭	২৩
১৬	সপ্তম সহমর্মিতা ও সমন্বয় পাঠক্রম		১০০
১৭	দ্বিতীয় উপদেশনা দক্ষতা উন্নয়ন পাঠক্রম	৬৭	৩৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ বার্ষিক প্রতিবেদন-১৯৯৫-৯৬, সাভার, ঢাকা, পৃ-৩৬।

সারণি -৮ ঃ বিভিন্ন পাঠক্রমে অনুষদ ও অতিথি বক্তাদের গড় প্রশিক্ষণভার বহনের তুলনামুলক বিবরণী, ১৯৯৫-৯৬

ক্রমিক	পাঠক্রমের নাম	প্রশিক্ষণভার বহনের পরিমাণ (%)	
		অতিথি বক্তা	অনুষদ বক্তা
১	পঞ্চদশ আচরণ ও শৃঙ্খলা পাঠক্রম	৮১	১৯
২	২৪তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন পাঠক্রম	৪৩	৫৭
৩	৩য় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পাঠক্রম	২০	৮০
৪	ষোড়শ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম	২০	৮০
৫	পঞ্চম অফিস ব্যবস্থাপনা পাঠক্রম	১২	৮৮
৬	চতুর্দশ সংক্ষিপ্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পাঠক্রম	০৬	৯৪
৭	পঞ্চম দারিদ্র দূরীকরণ পাঠক্রম	৭৫	২৫
৮	তৃতীয় উন্নয়ন প্রশাসন পাঠক্রম	৩১	৬৯
৯	সপ্তদশ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম	১৭	৮৩
১০	একাদশ মানবিক সম্পর্ক পাঠক্রম	১১	৮৯
১১	২২তম সিনিয়ার ষ্টাফ কোর্স	৪২	৫৮
১২	২৫তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন পাঠক্রম	৪৮	৫২
১৩	দশম আর্থবিধি ও পদ্ধতি পাঠক্রম	৬১	৩৯
১৪	একাদশ গবেষণা পদ্ধতি পাঠক্রম		১০০
১৫	দ্বিতীয় নীতি বিশ্লেষণ ও সমন্বয় পাঠক্রম	৭৭	২৩
১৬	সপ্তম সহমর্মিতা ও সমন্বয় পাঠক্রম		১০০
১৭	দ্বিতীয় উপদেশনা দক্ষতা উন্নয়ন পাঠক্রম	৬৭	৩৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ বার্ষিক প্রতিবেদন-১৯৯৫-৯৬, সাভার, ঢাকা, পৃ-৩৬।

সারণি -৯ ঃ বিপিএটিসি'র কর্মজীবন উন্নয়ন পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত উপ-অবয়বসমূহের অর্জিত ফলপ্রসূতার মাত্রা

ক্রমিক	উপ-অবয়বের নাম	অর্জিত ফলপ্রসূতার মাত্রা (%)	
		প্রথমার্ধে (৪র্থ কোর্স)	সর্বশেষ (২৪তম কোর্স)
ক.	সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স		
	– লোক-প্রশাসন ও নীতি বিশ্লেষণ	৮৪	৭৯
	– জাতীয় ইস্যুসমূহ	–	৮৩
	– সরকারী পদ্ধতি	–	৮০
	– প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সৃষ্টি	–	৭৭
	– নীতি বিশ্লেষণার্থে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশক সমূহ অনুধাবন করা বা বোঝা		৮৩
	– আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক	৮৮	৮২
	– অর্থনৈতিক সেক্টরের সংস্কার ঃ কার্যক্রম এজেন্ডা	–	৮২
	– আর্থিক বিশ্লেষণ	–	৮০
	– কম্পিউটারভিত্তিক এম আই এস	–	৬৮
	– শিশু ও নারী উন্নয়ন	–	৭২
	– গ্রাম উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ	৯০	–
	– তৃতীয় বিশ্বের পাবলিক এন্টারপ্রাইজ ব্যবস্থাপনার ইস্যুসমূহ	৮৬	–
	– বাংলাদেশের পরিকল্পনা কৌশল ও গুরুত্বপূর্ণ নীতি-ইস্যুসমূহ	৯২	–
	– অর্থনৈতিক উন্নয়নের লিডিং ইস্যুসমূহ	৯৩	–

চলমান-২

ক্রমিক	উপ-অবয়বের নাম	অর্জিত ফলপ্রসুতার মাত্রা (%)	
		প্রথমার্ধে (৪র্থ কোর্স)	সর্বশেষ (২৭তম কোর্স)
খ.	**এসিএডি কোর্স**		
	– সরকারী পদ্ধতি	৭৪	৭৫
	– সংগঠন উন্নয়ন/সংগঠন তত্ত্ব	৭৩	৭০
	– স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	–	৬৬
	– প্রকল্প প্রণয়ন/ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৭৭	৯২
	– প্রকল্প নির্ধারণ/ঘটনা সমীক্ষা ও উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ	৮০	৯০
	– মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা	–	৭৩
	– অর্থবিধিমালা/নিয়মাবলী	–	৮২
	– সরকারী বাজেট প্রণয়ন	–	৮৮
	– অর্থনৈতিক উন্নয়নের লিডিং ইস্যুসমূহ	৯০	৭০
	– আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক	৭৫	৭৩
	– বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌসলসমূহ	৭২	৬৯
	– দারিদ্র বিমোচন ঃ ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ	–	৬৫
	– শিশু ও নারী উন্নয়ন		৩৩
	– কম্পিউটার এম আই এস	–	৬৪
	– সচিবালয় ব্যবস্থাপনা	৭৩	–
	– প্রশাসনিক যোগাযোগ	৭৫	–
	– প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৬৪	–
	– আর্থিক ও কর্মী ব্যবস্থাপনা	৭২	–
	– অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মৌল বিষয়সমূহ	৭৩	–

চলমান-৩

ক্রমিক	উপ-অবয়বের নাম	অর্জিত ফলপ্রসূতার মাত্রা (%)	
		প্রথমার্ধে (৪র্থ কোর্স)	সর্বশেষ (১৯তম কোর্স)
গ.	**বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম**		
	– বাংলাদেশ চর্চা	৭৯	৭৩
	– লোক প্রশাসন	৮০	৭৫
	– ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া	৮১	৭৬
	– উন্নয়ন অর্থনীতি	৭১	৭৬
	– ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম	–	৬১
	– কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	–	৫০
	– বার্ড/আরডিএ সংযুক্তি	৭৭	৭৯
	– সচিবালয় সংযুক্তি	৭২	৭৪
	– গ্রাম সমীক্ষা কার্যক্রম	৭৪	৭৫
	– পুস্তক সমালোচনা ও মৌখিক উপস্থাপন কার্যক্রম	৮২	৮৩
	– টার্ম পেপার প্রণয়ন	–	৭৭
	– সিন্ডিকেট পদ্ধতি	৭৫	৭৯
	- শরীর চর্চা ও খেলাধুলা কার্যক্রম	৭৮	৮০
	– গাড়ী চালনা কার্যক্রম	–	৭৩
	– নৌকা চালনা কার্যক্রম	–	৬১
	– সম্প্রসারণ বক্তৃতা		৬৭
	– লাইব্রেরী কার্যক্রম	–	৬৩

উৎস ঃ মূল্যায়ন অনুবিভাগ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের বেশিরভাগ অধিবেশন এখন অনুষদ সদস্যগণ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। মধ্য-সোপান পাঠক্রমে এ পরিমাণ অধিকাংশেরও বেশি। সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সে অনুষদ প্রশিক্ষণভার বহনের পরিমাণ কিছুটা কম হলেও অন্যান্য সংক্ষিপ্ত পাঠক্রমসমূহে এ পরিমাণ সাধারণত ৭০ শতাংশের বেশি। তবে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত পাঠক্রমে এখনো বেশিরভাগ অতিথি বক্তার উপর নির্ভর করতে হয় (সারণি-৮)। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ মূল্যায়নে দেখা গেছে, দু'একটি বিশেষ-ক্ষেত্র ছাড়া কেন্দ্রের অনুষদদের মধ্যে পাঠক্রম সমন্বয়ন, পাঠক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি-১১)। পাঠক্রমসমূহের বিভিন্ন উপ-অবয়বের ফলপ্রসূতার মাত্রা অর্জিত হয়েছে আশাতীতভাবে (সারণি-৯) এবং পাঠক্রমের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলীও কার্যকরভাবে ফলপ্রসূ হচ্ছে[৪১]। তবে একথা সত্য যে, এ সমস্ত ক্ষেত্রে এখনো যথেষ্ট উন্নয়নের অবকাশ রয়েছে।

---

৪১ বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন পাঠক্রমের প্রশিক্ষণ সমাপনী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, মূল্যায়ন অনুবিভাগ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

সারণি -১০ ঃ বিপিএটিসি'র কর্মজীবন উন্নয়ন পাঠক্রমে ব্যবহৃত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিসমূহের ফলপ্রসূতা

ক্রমিক	উপ-অবয়বের নাম	অর্জিত ফলপ্রসূতার মাত্রা (%)	
ক.	সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স	প্রথমার্ধে (৪র্থ কোর্স)	সর্বশেষ (২৪তম কোর্স)
	– বক্তৃতা ও আলোচনা	৮৮	৮২
	– ঘটনা সমীক্ষা	৯০	৮২
	– সিন্ডিকেট/দলীয় আলোচনা	৮৫	৮৪
	– রিডিং এসাইনমেন্ট/লাইব্রেরী কার্যক্রম	৭২	৭৪
	– শিক্ষা সফর/স্থান পরিদর্শন	৮৫	৮৬
	– সেমিনার পেপার ও উপস্থাপনা	৮৮	৯০
	– ফিল্ম/ভিডিও শো	৭৯	৮০
	– সম্প্রসারণ বক্তৃতামালা	–	৬৯
খ.	এসিএডি কোর্স	প্রথমার্ধে (৪র্থ কোর্স)	সর্বশেষ (২৭তম কোর্স)
	– বক্তৃতা ও আলোচনা	৮০	৭৬
	– সেমিনার	৮২	৮৩
	– সিন্ডিকেট কার্যক্রম	৮৫	৮৪
	– শিক্ষা সফর	৮৭	৮৫
	– বিভাগীয় উপস্থাপনা	–	৮৯
	– ব্যাক্তিগত এসাইনমেন্ট	৮৮	৯৪
	– ঘটনা সমীক্ষা	৮৫	৭৪

চলমান পাতা-২

ক্রমিক	উপ-অবয়বের নাম	অর্জিত ফলপ্রসুতার মাত্রা (%)	
ক.	এসিএডি কোর্স	প্রথমার্ধে (৪র্থ কোর্স)	সর্বশেষ (২৪তম কোর্স)
	– স্থান পরিদর্শন	৮৪	৮৯
	– লাইব্রেরী কার্যক্রম	৭৯	৮১
গ.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম	প্রথমার্ধে (৪র্থ কোর্স)	সর্বশেষ (১৯তম কোর্স)
	– বক্তৃতা ও আলোচনা	৮০	৭৫
	– সেমিনার	–	৭৪
	– সিন্ডিকেট কার্যক্রম	৭৬	৭৯
	– সংযুক্তি (বার্ড/আরডিএ/সচিবালয়)	৭৫	৭৬
	– গ্রাম সমীক্ষা	৭৫	৭৫
	– শরীর চর্চা ও খেলাধুলা	৭৯	৮০
	– বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ	–	৬৬
	– কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	–	৫০
	– মৌখিক উপস্থাপনা	৮৫	৮৩
	– ভাষা শিক্ষা	–	৬১
	– টার্ম পেপার	–	৭৭
	– সম্প্রসারণ বক্তৃতা	–	৬৭
	– লাইব্রেরী কার্যক্রম	–	৬৩

উৎস ঃ মূল্যায়ন অনুবিভাগ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

সমীক্ষার উত্তরদাতাদের মতে কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধির কাম্য লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ করে (১) দক্ষ ও মেধাবী প্রশিক্ষকদের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে; (২) শক্তিশালী নিজস্ব অনুষদ উন্নয়ন; (৩) আন্ত:বিভাগীয় সমন্বয় জোরদারকরণ; (৪) দেশীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়/পরামর্শকের সাথে কেন্দ্রের যোগাযোগ/সংযোগের নিবিড়তা বৃদ্ধি; (৫) বিভিন্ন উৎসের আন্তঃঅনুষদ/কর্মচারি দ্বন্দ্ব/বৈষম্য নিরসনে প্রয়োজনীয় প্রয়াস নেয়া; (৬) অনুষদদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, পাঠ্যসূচি উন্নয়ন, আপডেটিং, সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তকরণে ব্যক্তি নির্ভরশীলতার পরিবর্তে প্রাতিষ্ঠানিকতা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ প্রক্রিয়ায় এখনো অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সময়ের চাহিদার আলোকে বিভিন্ন পাঠক্রমের উপ-অবয়ব ও পাঠ্যসূচি'তে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে (সারণি-৯)। বিভিন্ন পাঠক্রমে ব্যবহৃত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ যথার্থ ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হচ্ছে। তবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ বক্তৃতার অন্তর্ভুক্তি, গ্রন্থাগার কার্যক্রম এখনো প্রত্যাশিত মাত্রার ফলপ্রসূতা অর্জন করতে পারেনি (সারণি-১০)। সামগ্রিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিকতা সৃষ্টির দৃষ্টিকোণে প্রকল্পটি ফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু তথাপি কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিকতা উন্নয়নের বিভিন্ন উপকরণসমূহের বিষয়ে এখনো অনেক করণীয় রয়েছে।

সারণি -১১ ঃ বিপিএটিসি'র কর্মজীবন উন্নয়ন পাঠক্রম ব্যবস্থাপনার ফলপ্রসূতা

ক্রমিক	ব্যবস্থাপনার দিকসমূহ	অর্জিত ফলপ্রসূতার মাত্রা (%)	
ক.	সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স	প্রথমার্ধে (৪র্থ কোর্স)	সর্বশেষ (২৪তম কোর্স)
	– পাঠক্রম পরিচালনায় দক্ষতা	৯১	৭২
	– পাঠক্রম সমন্বয়নে দক্ষতা	৮৫	৯৪
	– সামগ্রিক পাঠক্রম ব্যবস্থাপনা	৯২	৮২
	– অনুষদ তত্ত্বাবধায়ন	৮৮	৬৩
	– মূল্যায়ন পদ্ধতি	৭৩	৭৪
	– শ্রেণীকক্ষ সুবিধা	৭৮	৭৯
	– রিডিং ম্যাটেরিয়ালস্	৮৫	৮৬
	– আহার ব্যবস্থাপনা	৭৬	৭৬
	– ডরমিটরী সুবিধাদি	৭০	৬৮
	– খেলাধুলা সুবিধাদি	৭২	৭১
	– চিকিৎসা সুবিধাদি	৫৯	৫৮
খ.	এসিএডি কোর্স	প্রথমার্ধে (৪র্থ কোর্স)	সর্বশেষ (২৭তম কোর্স)
	– পাঠক্রম পরিচালনায় দক্ষতা	৯০	৭৯
	– পাঠক্রম সমন্বয়নে দক্ষতা	৮১	৯১
	– সামগ্রিক পাঠক্রম ব্যবস্থাপনা	৮৮	৮৯
	– অনুষদ তত্ত্বাবধায়ন	৮৫	৬৭
	– মুল্যায়ন পদ্ধতি	৭২	৭৩
	– শ্রেণীকক্ষ	৮১	৮০
	– রিডিং ম্যাটেরিয়ালস্	৮২	৮৫

চলমান পাতা-২

ক্রমিক	ব্যবস্থাপনার দিকসমূহ	অর্জিত ফলপ্রসূতার মাত্রা (%)	
খ.	এসিএডি কোর্স	প্রথমার্ধে (৪র্থ কোর্স)	সর্বশেষ (২৭তম কোর্স)
	– আহার ব্যবস্থাপনা	৫৮	৫৪
	– ডরমিটরী সুবিধাদি	৫৪	৫১
	– খেলাধুলা সুবিধাদি	৭০	৬৮
	– চিকিৎসা সুবিধাদি	৪৫	৪৮
গ.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম	প্রথমার্ধে (৪র্থ কোর্স)	সর্বশেষ (১৯তম কোর্স)
	– পাঠক্রম পরিচালনায় দক্ষতা	৯৫	৮৫
	– পাঠক্রম সমনয়নে দক্ষতা	৮২	৯২
	– সামগ্রিক পাঠক্রম ব্যবস্থাপনা	৮৭	৮৫
	– অনুষদ তত্ত্বাবধায়ন	৮৮	৭০
	– আহার ব্যবস্থাপনা	৬৫	৬৯
	– ডরমিটরী সুবিধাদি	৬৯	৭০
	– মূল্যায়ন পদ্ধতি	৭৮	৭৯
	– শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা	৮৫	৮৩
	– গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা	৮২	৮৩
	– শরীর চর্চা ও খেলাধুলা সুবিধাদি	৮৭	৯৭
	– চিকিৎসা সুবিধাদি	৫০	৫৪

উৎস ঃ মূল্যায়ন অনুবিভাগ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

২.৫ প্রয়োজনীয় ভৌত ও অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি

আইএমইডি'র মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, পরিকল্পিত উদ্দেশ্যের আলোকে বিপিএটিসি'তে প্রয়োজনীয় ভৌত ও অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে (সারণি-২)। পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের সীমাবদ্ধতার আলোকে তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সৃষ্টি করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে[৪২] এবং তার বাস্তবায়ন কাজ চলছে। তবে নানা সীমাবদ্ধতা স্বত্ত্বেও সৃষ্ট সুবিধাদিকে মোটামুটি আশাব্যঞ্জক হিসেবে অভিহিত করা যায়। ৫৪.২৪ একর জমির ওপর সুদৃশ্য মিলনায়তন, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, ক্যাফেটারিয়া, মসজিদ, ৩টি প্রশাসনিক/ অনুষদ ভবন, ৩টি ডরমিটরি, সিন্ডিকেট ভবন, শপিং কমপ্লেক্স, বিভিন্ন টাইপের আবাসিক ভবন, সংযোগ করিডোর ইত্যাদি নির্মাণ করে বিপিএটিসি'র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার্থে চত্বরটিকে দর্শনীয় ও সুসজ্জিত করা হয়েছে[৪৩]। দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুপস্থিত ছিল এমন অনেক সুবিধাদিই এ প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে[৪৪]। তবে ডরমিটরি ভবনের স্বল্প-পরিসর কক্ষ, আবাসিক ও অন্যান্য এলাকায় নির্মাণ কাজের নিম্নমান এগুলো এ সকল ভৌত সুবিধাদির সীমাবদ্ধতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের কার্যক্রমের পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা ও বর্তমান চাহিদার আলোকে কেন্দ্রের তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় আরো বেশি ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ভৌত ও অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির দৃষ্টিকোণে বিপিএটিসি'কে একটি ফলপ্রসূ প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

২.৬ বিদ্যমান সুবিধাদির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা

উত্তরদাতাদের বিচারে বিপিএটিসি'র শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অন্যদিকে

---

৪২ Bangladesh Public Administration Training Center. : *Project Proforma : Public Administration Efficiency Development (BPATC 3rd Phase) Project*. Savar, Dhaka, 1996, pp. 64-66.

৪৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ঃ *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায় (সংশোধিত) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন*, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ-৩১

৪৪ Anisuzzaman, M. et al. : Bangladesh Public Administration Training Center Phase-II Project : An Evaluation. BPATC, Savar, Dhaka, 1990, p.7019

প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা সুবিধাদি ও প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি (ফটোকপিং, ডুপ্লিকেটিং,অডিও-ভিজুয়াল ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ উপকরণ (হ্যান্ড আউট) সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সবচেয়ে খারাপ বলে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থাপনা মোটামুটি ভাল।

উত্তরদাতাদের মতে, সামগ্রিক পাঠক্রম পরিচালনা, পাঠক্রম সমন্বয়, পাঠক্রম ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনুষদদের দক্ষতার মান ভাল। অনুষদ বক্তা হিসেবে উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা তুলনামূলকভাবে ভাল। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট পাঠক্রমের অংশগ্রহণকারীদের মতানুসারে দু'একটি বিশেষ ক্ষেত্র বাদে এ সকল ক্ষেত্রে বিপিএটিসি অনুষদদের দক্ষতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়[৪৫]। সময়ের পরিসরে ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে দক্ষ কর্মকর্তাদের অভাবের কারণে আগের তুলনায় কেন্দ্রের পাঠক্রম পরিচালন দক্ষতা কমেছে, কিন্তু পাঠক্রম সমন্বয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি-১১)। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে সহকারী পরিচালক ও উপ-পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বেড়েছে। যদিও সুষ্ঠু ও কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদানে এবং বিশেষ করে বিপিএটিসি'কে একটি "অনুপম কেন্দ্র" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা উন্নয়নের অবকাশ রয়েছে, তথাপি ব্যবস্থাপনার দিকে থেকে বিপিএটিসি'কে একটি টেকসই প্রকল্প হিসেবে গণ্য করা যায়।

২.৭ কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক স্থৈতিকতা

প্রাতিষ্ঠানিক স্থৈতিকতাকে কোন প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেন্দ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক স্থৈতিকতা হচ্ছে এখানে সৃষ্ট অবকাঠামোগত ও অন্যান্য সুবিধাদি। এসকল সুবিধাদির কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে কেন্দ্রের ভাবমূর্তি অধিকতর সমুজ্জ্বল করে তোলা সম্ভব। কেন্দ্রে বিরাজমান সামগ্রিক ভৌত প্রশিক্ষণ পরিবেশ গ্রহণযোগ্য মাত্রায় ভাল, এখানে রয়েছে উন্নত গ্রন্থাগার সুবিধা, উন্নত প্রশিক্ষণ উপকরণ। তবে এখানকার অনুষদ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই দুর্বল। কেন্দ্রের নিজস্ব অনুষদ উন্নয়নের বিশেষ এবং গ্রহণযোগ্য কোন ম্যাকানিজম গড়ে ওঠেনি। বিপিএটিসি'র অনিন্দ্য সুন্দর ভৌত পরিবেশ সকলকে আকৃষ্ট করে। একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক স্থৈতিকতা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা, অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, সনামধন্য দেশি ও বিদেশি

---

৪৫ বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠক্রমের প্রশিক্ষণ সমাপনী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, মূল্যায়ন অনুবিভাগ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা সুবিধাদি ও প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি (ফটোকপিং, ডুপ্লিকেটিং,অডিও-ভিজুয়াল ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ উপকরণ (হ্যান্ড আউট) সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সবচেয়ে খারাপ বলে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থাপনা মোটামুটি ভাল।

উত্তরদাতাদের মতে, সামগ্রিক পাঠক্রম পরিচালনা, পাঠক্রম সমন্বয়, পাঠক্রম ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনুষদদের দক্ষতার মান ভাল। অনুষদ বক্তা হিসেবে উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা তুলনামূলকভাবে ভাল। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট পাঠক্রমের অংশগ্রহণকারীদের মতানুসারে দু'একটি বিশেষ ক্ষেত্র বাদে এ সকল ক্ষেত্রে বিপিএটিসি অনুষদদের দক্ষতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়[৪৫]। সময়ের পরিসরে উর্ধ্বতন পর্যায়ে দক্ষ কর্মকর্তাদের অভাবের কারণে আগের তুলনায় কেন্দ্রের পাঠক্রম পরিচালন দক্ষতা কমেছে, কিন্তু পাঠক্রম সমন্বয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি-১১)। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে সহকারী পরিচালক ও উপ-পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বেড়েছে। যদিও সুষ্ঠু ও কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদানে এবং বিশেষ করে বিপিএটিসি'কে একটি "অনুপম কেন্দ্র" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা উন্নয়নের অবকাশ রয়েছে, তথাপি ব্যবস্থাপনার দিকে থেকে বিপিএটিসি'কে একটি টেকসই প্রকল্প হিসেবে গণ্য করা যায়।

২.৭ কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক স্থৈতিকতা

প্রাতিষ্ঠানিক স্থৈতিকতাকে কোন প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেন্দ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক স্থৈতিকতা হচ্ছে এখানে সৃষ্ট অবকাঠামোগত ও অন্যান্য সুবিধাদি। এসকল সুবিধাদির কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে কেন্দ্রের ভাবমূর্তি অধিকতর সমুজ্জ্বল করে তোলা সম্ভব। কেন্দ্রে বিরাজমান সামগ্রিক ভৌত প্রশিক্ষণ পরিবেশ গ্রহণযোগ্য মাত্রায় ভাল, এখানে রয়েছে উন্নত গ্রন্থাগার সুবিধা, উন্নত প্রশিক্ষণ উপকরণ। তবে এখানকার অনুষদ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই দুর্বল। কেন্দ্রের নিজস্ব অনুষদ উন্নয়নের বিশেষ এবং গ্রহণযোগ্য কোন ম্যাকানিজম গড়ে ওঠেনি। বিপিএটিসি'র অনিন্দ্য সুন্দর ভৌত পরিবেশ সকলকে আকৃষ্ট করে। একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক স্থৈতিকতা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা, অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, সনামধন্য দেশি ও বিদেশি

---

৪৫ বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠক্রমের প্রশিক্ষণ সমাপনী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, মূল্যায়ন অনুবিভাগ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সাথে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংযোগের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ইতোমধ্যে কেন্দ্রের সাথে দেশি-বিদেশি অনেক প্রতিষ্ঠান ।সংস্থার সংযোগ স্থাপিত হলেও দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তা অত্যন্ত অপ্রতুল। বিদগ্ধ জনের মতে, বিপিএটিসি'কে একটি ''অনুপম কেন্দ্র'' হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন-প্রয়াস বাস্তবায়ন করা খুবই সুদূর পরাহত। তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সদিচ্ছার সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটলে অচিরেই তা অর্জন করা অসম্ভব নয়। আশার কথা, বর্তমানে কেন্দ্রকে একটি আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে উন্নীতকরণের সক্রিয় প্রয়াস অব্যাহত আছে। প্রশিক্ষণের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে কেন্দ্রে বিদ্যমান মূল্যায়ন পদ্ধতি ও ফলাবর্তন প্রক্রিয়া অত্যন্ত কার্যকর এবং দেশের অনেক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এমন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার অভাব রয়েছে। সুতরাং প্রাতিষ্ঠানিক স্থৈতিকতার দিক বিচারে বিপিএটিসি একটি টেকসই প্রকল্প।

২.৮ বিপিএটিসি'কে একটি ''অনুপম কেন্দ্র'' হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন-প্রয়াসের বাস্তবতা

বিপিএটিসি কি সত্যিকার অর্থে একটি অনুপম কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত? না কি এ এক অন্ত:স্বার শূন্য শ্লোগান মাত্র? এ স্বপ্ন-প্রয়াসের বাস্তবতা কি? বিপিএটিসি একটি অনুপম কেন্দ্র নয়, একথা সত্য। কিন্তু দেশের লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ অঙ্গনে এটি একটি একক ও শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ প্রেক্ষিত বিবেচনায় বিপিএটিসি'কে পাশ কাটিয়ে অন্য কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে ''অনুপম কেন্দ্র'' হিসেবে গড়ে তোলার অবকাশ নেই। এ স্বপ্ন-প্রয়াস-কে বাস্তবে রূপদান করতে হলে বিপিএটিসি'কে ঘিরেই তা করতে হবে। তবে উত্তরদাতাদের মতে, এ ক্ষেত্রে যে বিষয় দু'টি সর্বাগ্রে নিশ্চিত করা দরকার তা হলো, নিজস্ব অনুষদ উন্নয়নে পর্যাপ্ত বৈদেশিক উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং উদ্যোগী, মেধাবী, চরিত্রবান, নির্ভিক, নিরপেক্ষ এবং মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারি দ্বারা কেন্দ্র পরিচালনা করা।

দীর্ঘ ১২টি বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দক্ষ প্রশিক্ষক গড়ে না ওঠা কেন্দ্রের স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে যেমন অন্তরায়, তেমনি ''অনুপম কেন্দ্র'' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তা এক উন্মুক্ত হুমকি হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং দ্রুত কেন্দ্রের নিজস্ব অনুষদ উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া আর যে বিষয়গুলো অধিকতর গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া দরকার তা হলো ঃ (১) প্রশিক্ষকদের সুষ্ঠু কর্ম-জীবন পরিকল্পনা প্রণয়ন; (২) যোগ্য প্রার্থীকে যথাসময়ে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা এবং সুষ্ঠু পদায়ন নিশ্চিত করা; (৩) সুষ্ঠু

প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণপূর্বক পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও পাঠক্রম পরিচালনা করা, (৪) প্রশিক্ষণ উন্নয়নে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন; (৫) নিজস্ব ও প্রেষণে নিযুক্ত অনুষদদের মধ্যে একটি নিবিড় ও সুস্থ্য কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা; (৬) দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান, সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় উপদেশনা সম্প্রসারিত করা; (৭) লভ্য প্রশিক্ষণ উপকরণের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং (৮) যোগ্যতার মাপকাঠিতে মেধাবী ও দক্ষ প্রশিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা-প্যাকেজ সম্প্রসারিত করা।

সংশ্লিষ্ট মহল কি সত্যিকার অর্থে এ সকল বিষয় নিশ্চিত করার জন্য ঐকান্তিকভাবে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন? যদি করেন, তবেই তা অনুপম কেন্দ্র সৃষ্টির প্রধান সোপান হিসেবে বিবেচিত হবে।

২.৯ বিপিএটিসি'র বিদ্যমান সমস্যাসমূহ এবং সম্ভাব্য সমাধান

কোন একটি প্রতিষ্ঠান তার উন্নয়নের শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করলেও সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক নানাবিধ সমস্যা থাকতে পারে। তেমনি বিপিএটিসি'র সম্ভাবনাময়তার সাথে সাথে তার সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতা অনেক। উত্তরদাতাবৃন্দ কেন্দ্রের যে সকল বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) দীর্ঘদিন একই পদে চাকরি করা ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা স্বত্ত্বেও পদোন্নতির সুযোগ না থাকায় কেন্দ্রের নিজস্ব অনুষদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে; (২) দেশে আর্মড ফোর্সদের প্রশিক্ষণকে যতটা গুরুত্ব দেয়া হয়, সিভিল প্রশাসনে প্রশিক্ষণকে ততটা দেয়া হচ্ছে না, ফলে কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ উন্নয়ন উপেক্ষিত হচ্ছে; (৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কেন্দ্রের নিজস্ব অনুষদ-কর্মচারিদের কোন কর্মজীবন পরিকল্পনা প্রণীত হয়নি; (৪) অনুষদ উন্নয়ন ও তাদের মেধা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাকানিজমের অভাব রয়েছে; (৫) কেন্দ্রে প্রতিশ্রুতিশীল ও মেধাবী প্রশিক্ষক নিয়োগের বা তাদেরকে স্থায়ীভাবে বা দীর্ঘদিন নিয়োজিত রাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব অত্যন্ত প্রকট; (৬) অনুষদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে না; (৭) কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগের অভাব রয়েছে; (৮) কেন্দ্রে কর্মরত বিভিন্ন উৎসের অনুষদ-কর্মচারিদের মধ্যে সঙ্গত কারণে বিরাজ করছে অনভিপ্রেত দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য; (৯) সরকার বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের আরোপিত আচরণে কেন্দ্রকে ডাম্পিং গ্রাউন্ড হিসেবে অনুমিত হয়।

এছাড়া সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও তদনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যর্থতা,

সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ পাঠ্যসুচি/কারিকুলাম উন্নয়নের ব্যর্থতা এবং দুর্বল অনুষদ ইত্যাদি কেন্দ্রের বিশেষ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ সকল সমস্যা নিরসনে নিম্নে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখা হলো। এগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালিত হলে কেন্দ্রে অধিকতর সুষ্ঠু, ফলপ্রসূ ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে এবং কেন্দ্রের স্থায়ীত্ব আরো দীর্ঘায়িত হবে।

৩.০ সুপারিশমালা ও উপসংহার

৩.১ প্রণীত সুপারিশমালা

- প্রকৃত ব্যবহারিক চাহিদার ভিত্তিতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং দেশীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রশিক্ষণকে কর্মজীবন পরিকল্পনার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকগণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিজস্ব দক্ষ অনুষদ উন্নয়নের দ্রুত ও সর্বাত্মক প্রয়াস নিতে হবে;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর পেশাগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা দীর্ঘকাল প্রয়োগের সম্ভাবনা বিবেচনা করে প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে;
- প্রশিক্ষণকে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত ও বাধ্যতামূলক করতে হবে;
- প্রশিক্ষণ ভাতা, বিনা ভাড়ায় বাসস্থান, বিশেষ বেতনসহ সকল উৎসের অনুষদ/প্রশিক্ষকদেরকে সমতার ভিত্তিতে আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে;
- প্রশিক্ষকদের জন্য সুষ্ঠু কর্মজীবন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;
- যোগ্য অনুষদকে যথাসময়ে পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে এবং পদায়ন ও পদোন্নতি যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণপূর্বক পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, কারিকুলাম উন্নয়ন ও পাঠক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা নিতে হবে;
- উদ্যোগী, মেধাবী, চরিত্রবান, নির্ভিক, নিরপেক্ষ ও মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দ্বারা কেন্দ্র পরিচালনার ব্যবস্থা নিতে হবে;
- প্রশিক্ষণ উন্নয়নে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা থাকতে হবে এবং প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের মূল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করতে হবে;

- অনুষদ উন্নয়নে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যথাযথ তত্ত্বাবধান, সহযোগিতা ও অব্যাহত উপদেশনা সম্প্রসারিত করতে হবে;
- নিবেদিত প্রাণ, দক্ষ, সংশ্লিষ্ট বিষয়গত সংশ্লিষ্টতা সম্পন্ন ও প্রতিশ্রুতিশীল অনুষদ/প্রশিক্ষক (সরাসরি/প্রেষণে) নিয়োগ করতে হবে;
- প্রশিক্ষণের সাথে আধুনিক প্রযুক্তিকে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে;
- প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার উদ্ভাবনীমূলক, আধুনিক ও সর্বোচ্চ ফলপ্রসূ হতে হবে;
- প্রশিক্ষণের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিতে হবে;
- কেন্দ্রে আধুনিক প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার সর্বোচ্চ সম্প্রসারণ নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ বৃদ্ধির অব্যাহত প্রয়াস নিতে হবে;
- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে বিবেচনাযোগ্য প্রণোদনা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.২ উপসংহার

প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সময়ের প্রেক্ষাপটে পর্যায়ক্রমিক চাহিদার আলোকেই প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সম্প্রসারিত হয়। প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিপিএটিসি'র অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, আছে অনেক সবল দিক; আছে প্রতিশ্রুতিশীল প্রাতিষ্ঠানিক স্থৈতিকতা। এসব গুণগত দিক বিচারে বিপিএটিসি একটি টেকসই প্রকল্প। সময়ের নিবিষ্ট চাহিদার আলোকে বিপিএটিসি একটি "অনুপম কেন্দ্র" হিসেবে গড়ে উঠুক–এটি হোক আমাদের সংশ্লিষ্ট সকল মহলের একান্ত কাম্য।

গ্রন্থপঞ্জি

Anisuzzaman, M. et al. 1990 : *Bangladesh Public Administration Training Center Phase-II Project : An Evaluation*, BPATC, Savar, Dhaka.

Baum, Warren C. and Toolbet, Stokes M. 1985 : *Investing in Development*. New York, Oxford University Press.

Government of the People's Republic of Bangladesh. 1980 : *The Second Five Year Plan 1980-85*. Dhaka. para 19. 141.

Hirschman, Albert O. 1967 : *Development Projects Observed*. (Washington D. C., Brooking Institution).

Honadle, George and VanSant:, Jerry. 1998: *Implementation for Sustainability : Lessons from integrated Rural Development*. Kumarion Press, West Hartford.

Huda, A. T. M. Shamsul et al. 1988 : *Sustainability of Projects for Higher Agricultural Education : a case study of Bangladesh Agricultural University*. BPATC Case Study Series.

Institute of Public Administration. 1981: *Pre-Investment Study of a Public Administration Training and Management Improvement Project in Bangladesh*. IPA 1717, Massachusetts Avenue. N. Y., Washington D. C., 20046, USA.

Khan, Akbar Ali et al. 1988 : *Sustainability of Rural Development Project : a Case Study of Rural Development I Project, Bangladesh*. BPATC Case Study Series-4.

The World Bank. 1983: *Bangladesh Staff Appraisal Report : Public Administration (Training, Personnel and Management) Project*. South Asian Projects Department, Education and Manpower Development Unit, The World Bank Report No. 4181-BD.

The World Bank. 1985 : *Sustainability of Project : First Review Experience*, Report No. 5718, June.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ১৯৯৭ঃ *''বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দ্বিতীয় পর্ব (সংশোধিত) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন''*; আইএমইডি, পরিকল্পণা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

হোসেন, সৈয়দ মকবুল ও অন্যান্য ১৯৯১ ঃ *সাভারস্থ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডিজাইন, নির্মাণ ও ব্যয় সম্পর্কে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন*. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা কমিশন।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র. ১৯৯৬ ঃ বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৫-৯৬, সাভার, ঢাকা।

বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠ পর্যায়ে জন প্রশাসন প্রসঙ্গ

ডঃ তোফায়েল আহমেদ *

রাস্ট্রবিজ্ঞানের ধ্রুপদী সূত্র অনুসারে চারটি পরস্পর নির্ভরশীল উপাদান যথা নির্দিষ্ট ভূখন্ড, একটি জনগোষ্ঠি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্র নামক সংগঠন। এ চারটি উপাদানের মধ্যে ভূখন্ড ও সার্বভৌমত্বের ধারণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও এই দুইটি উপাদান নিজস্ব মহিমায় রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালনায় কখনও সক্রিয় হতে পারে না। জনগণ ও সরকার এই দুইটিই মূলতঃ রাষ্ট্রের সক্রিয় উপাদান বা মূল চালিকা শক্তি। রাষ্ট্রের প্রকাশ ও বিকাশ এই দুই উপাদানকে ঘিরেই গড়ে উঠে এবং প্রসারিত হয়ে থাকে।

রাষ্ট্র মূলতঃ একটি বিমূর্ত ধারণা। জনগণ ও সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্র ধারণা নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি পায় এবং লাভ করে একটি বিশিষ্ট চরিত্র।[১] সে চরিত্র স্থান কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন রকম বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত হয়ে রাজতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, কল্যাণমূলক প্রভৃতি নামে পরিচিতি পায়। সরকারই রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে এবং সার্বক্ষণিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে একটি প্রশাসনিক বা নির্বাহী কাঠামো সৃষ্টি করে। তাই সরকার ও প্রশাসনকে এক কথায় রাষ্ট্রযন্ত্র (Apparatus or machinery of the state) বলা হয়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড জীবন্ত হয়ে উঠে। রাষ্ট্রের এই রূপ ভয়ংকর এবং কল্যাণকর দুই রকমই হতে পারে। যেমন নিরঙ্কুশ ও বংশানুক্রমিক রাষ্ট্র, একাত্মবাদী ও সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার রাষ্ট্র, স্বার্থান্ধ সামন্ত বা বুর্জোয়াদের একক কব্জায় পরিচালিত রাষ্ট্র এবং বিশেষ কোন একক শ্রেণী বা শ্রেণীগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষাকারী প্রভৃতি চরিত্রের রাষ্ট্র সামগ্রিক জনকল্যাণের সহায়ক হয় না। তারা ভয়ানক ও ভয়ংকরভাবে জনবিরোধী হতে পারে। আবার কখনও কখনও তাদের অধীনে জন শোষণ প্রক্রিয়া সহনীয় পর্যায়েও থাকতে পারে। কিন্তু শোষণ, নিপীড়ন, দলন, স্খলন যে থাকবে তা এক রকম অবধারিত। এ জাতীয়

* লেখক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রাকার পানি উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্শক সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে কর্মরত।

কাঠামোর অধীনে সাধারণ জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে অবরুদ্ধ থাকে। আবার বিপরীতক্রমে গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমূলক ধারায়ও রাষ্ট্রের বিকাশ হতে পারে। যতই দিন যাচ্ছে সভ্যতা ততই অগ্রসর হচ্ছে। রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিকাশে কল্যাণমূলক দিক প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। যেখানে সমাজের সকল পেশা, শ্রেণী, বর্ণ, কর্ম, ধর্ম, লিঙ্গ, নির্বিশেষে সবার আনুপাতিক অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে, রাষ্ট্রের গণমুখী চরিত্র সেখানে অধিক বিকাশের সুযোগ পায়। তাই জনগণের অংশগ্রহণ ও জনজবাবদিহিতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের গণমুখিতা নির্ণিত হয়। আজকাল আধুনিক রাষ্ট্রীয় বিকাশের প্রবণতা গণতন্ত্র ও কল্যাণমুখী। তবে সর্বক্ষেত্রে এ বিকাশ বাধামুক্ত নয়। তাই কল্যাণমুখী রাষ্ট্রীয় বিকাশের লক্ষ্যে চলছে নিরন্তর পরিবর্তন ও প্রগতির সংগ্রাম এবং আন্দোলন। জনপ্রশাসন তথা রাষ্ট্র যন্ত্রের সংস্কার প্রচেষ্টাকেও সে সংগ্রাম এবং আন্দোলনের অংশ হিসাবে ধরে নেয়া যায়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র যন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ একটি বিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র যন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশিষ্ট কিছু মতবাদ প্রচলিত আছে।[২] তা ছাড়া প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্রের রয়েছে সুনির্দিষ্ট সামাজিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপাদান যা পরবর্তীতে সে সমাজে রাষ্ট্র গঠন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিকাশের পিছনে অবদান যুগিয়েছে।

এখানে এ প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় মতবাদসমূহ বা বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনার অবকাশ নেই। তবে জন প্রশাসন সংস্কারের মত বিষয়ের আলোচনায় ইতিহাসবিমুখতা আলোচনাকে মূল বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। তাই জন প্রশাসনের আলোচনায় ঐতিহাসিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃহত্তর ঐতিহাসিক পরিসর বিবেচনা করলে বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় রাষ্ট্র গঠন অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা।[৩] কিন্তু একটি বিশিষ্ট সামাজিক সত্তা, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি হিসাবে বাঙালী একটি সুপ্রাচীন সমাজ ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী।[৪] তাই সাম্প্রতিক কালের রাষ্ট্রগঠন ও রাষ্ট্রযন্ত্র সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার অংশ হিসাবেই বিবেচিত হওয়াই সঙ্গত।

বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয় ১৯৭১সালে। কিন্তু এ স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পূর্ববর্তী অন্ততঃ আড়াই হাজার বছর যাবত এ ভূখন্ডে বিভিন্ন আদল ও চরিত্রে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল।[৫] সে রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজস্ব রূপ ও চরিত্র অনুযায়ী এখানে রাষ্ট্রযন্ত্র বা সরকার ও প্রশাসনকে তৈরী করেছে। ১৯৭০ এর পূর্ব পর্যন্ত আড়াই হাজার বছরের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে কম বেশী ৫০০ থেকে ৭০০ বছর স্বাধীন রাজা ও

সুলতানদের অধীনে বাংলা শাসিত হয়।[৬] ইংরেজ ও পাকিস্তান যুগ বাদে বাকী সময় মূলতঃ একটি দূরবর্তী রাষ্ট্রের প্রান্তিক পর্যায়ের প্রদেশ হিসাবে বাংলাকে গণ্য করা হতো। ইংরেজ ও পাকিস্তান আমলে সে অবস্থার পরিবর্তন হলেও বাংলা এই দুই আমলেও একটি প্রদেশের মর্যাদাতেই শাসিত হয়েছে। তাই এদেশের রাষ্ট্র ও প্রশাসনের আধুনিক কাঠামো মূলতঃ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার। ঔপনিবেশিক ধারার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনস্থ একটি প্রাদেশিক পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোকে পরবর্তীতে স্বাধীন এককেন্দ্রিক দেশের প্রশাসনিক কাঠামো হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাই এখানে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কারের অনেক বিষয় রয়েছে যা হয়ত একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হবার দাবী রাখে।

স্বাধীনতার পর থেকে (১৯৭১ সনের পর) রাষ্ট্র যন্ত্রকে সংস্কারের উদ্দেশ্যে অনেকগুলো কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে।[৭] কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কমিটি বা কমিশনের প্রতিবেদনসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সরকারসমূহের কাছ থেকে যথাযথ মনোযোগ পায়নি। সাম্প্রতিককালে জাতীয় সরকারসমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, বিশ্ব ব্যাংক, যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সাহায্যসংস্থা (ইউ, এস এইড) প্রভৃতি সংস্থাও বিভিন্ন গবেষণা কর্মের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশাসনিক সংস্কারের তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে।[৮] কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কি আন্তর্জাতিক সাহায্যের বিভিন্ন শর্তের মধ্যে প্রশাসনিক সংস্কারকে অন্যতম একটি শর্ত হিসাবে আরোপ করা হচ্ছে।[৯] ১৯৯৭ সনের অক্টোবর মাসে সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেশে সর্বশেষ একটি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে এবং এই কমিশন একজন অতি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন চেয়ারম্যান (পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদায়) এবং একজন সদস্য সচিবসহ তিন জন পূর্ণকালীন সদস্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে। তা ছাড়া রয়েছেন আরও নয়জন পদাধিকার বলে নিযুক্ত সরকারী সদস্য। এই কমিশন ৯টি কার্যপরিধির (Terms of Reference) আওতায় কাজ করছে।[১০] বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার আওতায় কমিশনের কর্মপরিধির শুধুমাত্র একটি কার্যপরিধি প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্য দুটি কার্যপরিধি আংশিকভাবে সম্পর্কিত। ঐ কমিশনের কর্মপরিধির সংশ্লিষ্ট অংশ ক্রমিক নং অনুযায়ী নিম্নরূপ ঃ

(ঘ) সরকারী কর্মকান্ডের বিকেন্দ্রীকরণ ও ডিভলিউশন (Devolution) এর উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইনের সহিত সংগতি রাখিয়া সকল সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের জন্য সুপারিশ করা।

চ) মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং অন্যান্য সকল সরকারী অফিস এবং আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল পুনর্বিন্যাস, যুক্তিযুক্তকরণ, সংকোচন ও যুক্তিসংগতভাবে পুনর্গঠন করার বিষয়ে সুপারিশ করা।

ঝ) উপরি উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আইনগত বিধিগত প্রক্রিয়াসহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং উহাদের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণার্থে সুপারিশ করা।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠপর্যায়ের প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গ অবতারণায় বর্তমান প্রবন্ধকে সংক্ষিপ্ত কিছু পৃথক অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠ প্রশাসনের একটি সংক্ষিপ্ত তত্ত্বীয় আলোচনা উপস্থাপন করার পর দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশ ভূখন্ডে মাঠ প্রশাসনের ধারণার ঐতিহাসিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তৃতীয় অংশে বাংলাদেশে রাষ্ট্র গঠিত হবার পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের মাঠ প্রশাসন সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনার পর চতুর্থ অংশে বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় শাসন ও মাঠ প্রশাসন প্রসঙ্গের অবস্থা, অবস্থান ও সংস্কারের সুপারিশসমূহ স্থান পেয়েছে।

এক. বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠ প্রশাসন ঃ তত্ত্বীয় আলোচনা

১.১ বিকেন্দ্রীকরণ

বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনিক পরিভাষায় বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। শব্দগত অর্থে এটি অত্যন্ত সহজ এবং ঢালাওভাবে ব্যবহৃত হলেও তত্ত্বগত দিকটি তত সহজ নয়। কারণ ধারণাগতভাবে বিকেন্দ্রীকরণ রাজনীতি, প্রশাসন ও অর্থনীতির কিছু জটিল সূত্রের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। সাধারণ সংজ্ঞায় সরকারের উচ্চ পর্যায়ে থেকে নিম্নপর্যায়ে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের স্থানান্তরকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয় তবে এক্ষেত্রে এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের হস্তান্তর বা স্থানান্তর মূলতঃ দুটি প্রধান ক্ষেত্রে হতে পারে। প্রথমতঃ ভৌগোলিক বিভাজনে (Territorial Decentralization) কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায়ে যেমন বিভাগ, জেলা, থানা, ইউনিয়ন, গ্রাম প্রভৃতি প্রশাসনিক বিভিন্ন এককসমূহে ক্ষমতা দান; দ্বিতীয়ত কার্যক্রম ভিত্তিক পেশাদারিত্বের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি (Functional Decentralization) যেমন, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রকৌশল প্রভৃতি কার্যক্রমের জন্যে পৃথক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে কর্তৃত্ব গ্রহণ ও বন্টন।

১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে ডান, বাম, উদারনৈতিক, র‍্যাডিক্যাল প্রায় সকল মতের অনুসারীগণই নিজ নিজ তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধারণার প্রয়োগে উৎসাহ দেখাতে থাকেন। বিশেষ করে বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়ন প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। সনাতনী বামপন্থী ও নব্যবামপন্থী নির্বিশেষে সকল বামপন্থী রাজনীতিকগণ স্থানীয় গণতন্ত্র, কমসুবিধাভোগীদের মধ্যে পৌরসেবা সম্প্রসারণ, স্থানীয় রাষ্ট্রের চরিত্র বদল ইত্যাদির সাথে বিকেন্দ্রীকরণকে একটি আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যায়। স্থানীয় নির্বাচনেও বামপন্থীদের ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায়। তারা বৃটিশ হোয়াইট হাউজ দখলের পূর্ব প্রক্রিয়া হিসাবে টাউন হল দখলের কৌশলের কথা প্রচার করতে থাকেন।[১১] অপর দিকে সনাতনী ডান ও বাজারপন্থীগণও বিকেন্দ্রীকরণের নবতর ব্যাখ্যা হাজির করতে থাকেন। তারা উন্মুক্ত বাজারনীতি, জনগণকে যাচাই-বাছাই করার আরও ক্ষমতা দান, অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ ও হস্তক্ষেপ শিথিলকরণ, বি-আমলাতান্ত্রিকীকরণ, বিরাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদির সাথে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাকে যুক্ত করে দেয়। এভাবে বিকেন্দ্রীকরণ ধারণা বা তত্ত্ব হিসাবে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক গন্ডীর বাইরে বৃহত্তর সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

বর্তমান সময়ে বিকেন্দ্রীকরণকে তাই কোন একটি বিশেষ সংগঠনের ক্ষমতা কর্তৃত্বের প্রবাহ প্রক্রিয়ার সাথে খন্ডিতভাবে না দেখে সামগ্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি নিরন্তর ও চলমান প্রক্রিয়া হিসাবেই দেখা হয়। বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে সহজভাবে উপলব্ধির জন্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ এর সকল প্রকার ও পদ্ধতিগুলোকে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মাওহুদ, ছীমা ও রনডিনেলী ও আপহফ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[১২] মাওহুদ এই ধারণাকে বিপুঞ্জীভূতকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। ছীমা ও রনডিনেলী বিকেন্দ্রীকরণকে বিপুঞ্জীভূতকরণ (Deconcentration), অর্পণ (Devoluton), প্রত্যর্পণ (Delegetion) ও বিরাষ্ট্রীয়করণ (Privatisation) এই চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। আপহফ বিকেন্দ্রীকরণের শেষোক্ত ধারণা বিরাষ্ট্রীয়করণকে আরও তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করেন। যথা মধ্যস্থতাকরণ (Intermediation), সেবায়ন (philanthropisaion) এবং মুক্ত বাজার (Marketisation) ধারণাগুচ্ছের মাধ্যমে বিরাষ্ট্রীয়করণের ধারণাকে তিনি আরো অধিক সংহত করেছেন।

ক. বিপুঞ্জীভূতকরণ **(Deconcentration)**ঃ বিকেন্দ্রীকরণের বিপুঞ্জিভূতকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সরকারী বিভিন্ন বিভাগসমূহের

অভ্যন্তরের উচুঁ থেকে নীচু পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে স্থানান্তর বা হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়। প্রধানতঃ সরকারী বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কর্মকর্তাদের মধ্যে উপর থেকে নিচে হস্তান্তরই বিপুঞ্জীভূতকরণ।

খ. অর্পণ **(Devolution)** ঃ বিকেন্দ্রীকরণের নামে ক্ষমতা অর্পণ পদ্ধতি মূলতঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের হস্তান্তর। এ পদ্ধতির আওতায় জাতীয়ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রচলিত সংবিধানের আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বশীল সরকার কাঠামোর নিকট কিছু কিছু আইন, শাসন ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা অর্পণ করে থাকে। সাধারণত প্রাদেশিক সরকার এবং প্রদেশের নিম্নবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকারসমূহে ক্ষমতা অর্পণ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিপুঞ্জীভূতকরণের পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের অভ্যন্তরে নির্বাহী আদেশ বলে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। আর অর্পণ পদ্ধতির অধীনে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তথা আইন বিভাগের বা আইন অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ অন্য একটি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করে থাকে। যেমন পার্লামেন্ট বা সংসদ আইন পাশ করে কিন্তু রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম যে কোন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার সৃষ্টি ও তার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে। বিশেষতঃ সুনির্দিষ্টভাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকেই অর্পণ পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে devolition বা অর্পণ বাস্তবক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রায় সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে যায়। যুক্তরাজ্যের ওয়েলস্ ও স্কটল্যান্ডে স্বতন্ত্র পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সে দেশে ডিভলিউশন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ. প্রত্যর্পণ **(Delegation)** ঃ সাধারণ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতার প্রর্ত্যপণের (Delegation of Power) ধারণার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের আওতায় ক্ষমতার প্রত্যর্পণ মূলতঃ সংগঠনের অভ্যন্তরে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তার কাছে ক্ষমতা প্রত্যর্পণকে বুঝানো হয়। যেমন একটি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বোর্ড কিছু ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করতে পারেন। আবার ম্যানেজিং ডিরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার বা তৎপরবর্তীদের নিকট এমনকি

ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের নিকট কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করতে পারেন। কিন্তু ক্ষমতা প্রত্যর্পণের পরও সর্বশেষ জবাবদিহিতা প্রত্যর্পণকারী কর্মকর্তার উপরই বর্তায়। তাই ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতার প্রত্যর্পণ ও বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় প্রত্যর্পণ এক নয়। সরকারের সাধারণ মন্ত্রণালয় যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যখন কোন বিশেষায়িত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক বিশেষায়িত এজেন্সী বা সংস্থা গঠন করে এবং সে সংস্থাসমূহকে ঐ কার্যক্রমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে তখন তাকে বিকেন্দ্রীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যর্পণ বলা হয়। আমাদের দেশে মৎস্য, পশুসম্পদ, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন অধিদপ্তর, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা বিকেন্দ্রীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের দৃষ্টান্ত বহন করে।

ঘ. বিরাষ্ট্রীয়করণ **(Privatisation)** ঃ বিরাষ্ট্রীয়করণ বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্বের সমসাময়িক কালের সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের অধীনে সরকারের আকার আকৃতি ছোট করা এবং রাষ্ট্র শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণমূলক বা নিরাপত্তামূলক কাজসমূহ হাতে রেখে উন্নয়ন, ব্যবসায়িক ও অন্যান্য অর্থকরী কাজ বেসরকারী ও ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের কাছে হস্তান্তরের বিষয়টির উপর জোর দেয়। বলা হচ্ছে তাতে করে সরকার নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে তার জন্য নির্দিষ্ট কাজগুলো করতে পারবে। সরকারের আকার ও আয়তন বৃহৎ হওয়ার কারণে সরকার নিয়ন্ত্রণহীন ও অদক্ষ হয়ে পড়ছে। তাই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, ব্যবসা ও সেবা কার্যক্রমের অনেক কিছু ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর করার কথা ভাবা হচ্ছে। এমন কি উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্র ঋণ, তৃণমূল পর্যায়ে সাক্ষরতা প্রভৃতি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার হাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে বা সরকারী সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে বিরাষ্ট্রীয়করণের এই ধারণা একদিকে একটি আন্দোলন, অপরদিকে দাতাদের কাছ থেকে একটি শর্ত হিসাবে আরোপিত হচ্ছে। বিশেষতঃ মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠাকে সামনে রেখে বাণিজ্য উদারিকরণ, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আইন কানুন বিধিবিধানের নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ (Deregulation) প্রভৃতিকে বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বর্তমান প্রবন্ধে মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারকে জ্যোতিকেন্দ্রে রেখেই যেহেতু সকল আলোচনা, তাই জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কার্যপরিধিতে বিকেন্দ্রীকরণের শুধুমাত্র একটি পদ্ধতি ডিভলিউশনের উল্লেখ করা হলেও অন্যান্য তিনটি দিকও অবহেলার

অবকাশ নেই। কারণ বিভিন্ন সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষমতা কর্তৃত্বের বিন্যাসে বিপুঞ্জীভূতকরণ পদ্ধতি এবং তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম সংহত করার জন্যে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের (NGO) কার্যক্রম প্রসারের কথা চিন্তা করতে হলে সক্রিয়ভাবে বিরাষ্ট্রীকরণ পদ্ধতির প্রয়োগও যুগপৎ ভাবে করার প্রয়োজন দেখা দিবে। তাই দেখা যায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের জন্যে ডিভলিউশন যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তেমনি ডিভলিউশনকে প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্যে বিপুঞ্জীভূতকরণ ও বিরাষ্ট্রীকরণ পদ্ধতির উপরও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

১.২ মাঠ প্রশাসন তত্ত্ব

প্রত্যেকটি সমাজ ও রাষ্ট্রের নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, পরিবেশ, প্রয়োজন ইত্যাদির নিরিখে সে সমাজ ও রাষ্ট্রে রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মনীতি ও সংগঠন কাঠামো গড়ে উঠে। এক সময় জাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্র ছিল। গোত্র, দল, কৌম ও উপজাতীয় কাঠামো থেকে উপজাতি এভাবে ধীরে ধীরে একটি বৃহত্তর ভৌগোলিক কাঠামোতে রাষ্ট্র কাঠামোর অধিষ্ঠান। বহু জাতি, বহুভাষা, বহু ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি নিয়েও একটি আধুনিক একক রাষ্ট্র গঠিত হয়। তাই রাষ্ট্রের দর্শন, নিয়মনীতি ওপ্রশাসনিক কাঠামোতে এই সব কিছুরই কিছু কিছু প্রতিফলন ঘটে থাকে।

এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মাঠ প্রশাসন ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে সে প্রশাসনের একটি সাধারণ শ্রেণীবদ্ধকরণ করা যায়। সর্বক্ষেত্রে তা প্রতিটি দেশের হুবহু চিত্র না হলেও একটি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার বা অনুধাবনে সে শ্রেণীবদ্ধকরণ কিছুটা সহায়ক হতে পারে। এ. এম. এম শওকত আলী, ব্রায়ান স্মীথ ও রবার্ট সি ফ্রাইড এই তিন জনের মাঠ প্রশাসন সংক্রান্ত তিনটি পুস্তকের সহায়তায় মরহুম এম, এ খানের নেতৃত্বে ১৯৮২ সনে গঠিত প্রশাসনিক পুর্নগঠন ও সংস্কার কমিটির প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণীতে মাঠ প্রশাসনকে বিভক্ত করা হয়েছেঃ [১২]

ক. বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতি (Decentralised system)

খ. ফ্যাংশানাল পদ্ধতি (Functional system)

গ. প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি (Prefectoral system)

ক. বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিঃ বৃটেনের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতির সার্থক উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণমূলক (Regulatory) কাজসমূহ হাতে রেখে বাকী বিভিন্ন কাজ ব্যুরো, সিটি এবং কাউন্টি কাউন্সিলগুলোর কাছে স্থানান্তর করা হয়। হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উপর কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ক্ষেত্রে পৃথক কোন সংস্থা সৃষ্টি করে না। তবে সেবাসমূহের যাতে একটি ন্যূনতম গুণগতমান রক্ষা পায় সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক হস্তক্ষেপ অনাকাঙ্ক্ষিত বা নজীরবিহীন নয়। কোথাও কোন কারণে সেবার গুণগতমান বিঘ্নিত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ আসতে পারে। বৃটেনে স্থানীয় সরকারগুলোতে কাউন্সিলারগণ দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। প্রায় সকল স্থানীয় কাউন্সিল কোন না কোন দল (লেবার, লিবারেল-ডেমোক্রেটিক, কন্‌জারভেটিভ ও অন্যান্য স্থানীয় দল যথা স্কটিশ ন্যাশনাল, ওয়েলস ন্যাশনাল, সীনফেইন, আলষ্টার ইউনিয়নিষ্ট প্রভৃতি দল) এককভাবে বা কোয়লিশন করে নিয়ন্ত্রণ করে। বাকী কাউন্সিলগুলো নির্দলীয় ও দলীয় কাউন্সিলরদের মধ্যে কোয়লিশনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আমাদের দেশের ক্যারিয়ার সিভিল সার্ভেন্টের মত পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ক্যারিয়ার লোকাল কাউন্সিলার দেখা যায়। আমাদের দেশের মানুষ যেমন কোন স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্যে জেলা ও থানা ভিত্তিক স্থানীয় প্রশাসনের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত, ঐ সব দেশের মানুষ পুলিশ ও বিচার বিভাগের আওতায় না হলে ঐ একই বিষয়ের জন্যে সরাসরি স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর দিকে তাকাতে অভ্যস্ত।

খ. ফ্যাংশানাল পদ্ধতি ঃ ফ্যাংশানাল পদ্ধতির একটি আদর্শ উদাহরণ হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেকটি সংস্থা ও বিভাগের কাজকর্ম বিভাগীয় প্রধানের দপ্তরের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়। আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় মূলতঃ রাজনৈতিক প্রশাসনের অন্তর্গত। নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজগুলোয় সাধারণত ফেডারেল তথা কেন্দ্রীয়, ষ্টেট ও স্থানীয় এই তিন স্তরে দায়িত্ব ও ভূমিকার পরিষ্কার বিভাজন রেখা রয়েছে। আমেরিকান ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান প্রধান পর্যায়ে বিশেষতঃ স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে মেয়র, ষ্টেট পর্যায়ে গভর্ণর এবং ফেডারেল পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট শেষ পর্যন্ত জবাবদিহি করে থাকেন। অবশ্য মেয়র, গভর্ণর ও রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণের কাছে যেমন জবাবদিহি করেন তেমনিভাবে তারা আবার স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নির্বাচিত কাউন্সিল, স্টেট সভা, প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের কাছেও তাদের কাজের জন্যে জবাবদিহি করেন। এই ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাতারাতি জন্ম নেয়নি। বহুদিনের ক্রমাগত ধারাবাহিকতায় এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ. প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি ঃ মাঠ প্রশাসনের শ্রেণীবদ্ধকরণে তৃতীয় প্রকার বা ধরনটিকে প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এ পদ্ধতির সনাতনী উদাহরণ ফ্রান্স। এ পদ্ধতির অধীনে সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া মার্কিন ব্যবস্থার বিপরীত। এখানে সকল সমন্বয়ই মূলতঃ প্রশাসনিক কর্মের অন্তর্ভুক্ত। প্রিফেক্টরাল পদ্ধতিকে আবার প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, সমন্বিত প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি (integrated prefactoral system ও অসমন্বিত প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি (Unitegrated prefactoral system)। এই সমন্বিত ও অসমন্বিত পদ্ধতির সীমারেখা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সাথে প্রিফেক্টের সম্পর্কের ভিত্তিকে প্রধান নির্ণায়ক হিসাবে গণ্য করা হয়। ফরাসী দেশে মেয়র থাকা সত্ত্বেও প্রিফেক্টকে স্থানীয়ভাবে সকল সরকারী কর্মচারীদের প্রধান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এমনকি প্রিফেক্টের অধীনস্থ সকল বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ প্রিফেক্টের মাধ্যমেই নিজ নিজ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। প্রিফেক্ট একাধারে প্রশাসনিক প্রধান এবং জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি। প্রিফেক্টের এই ভূমিকা ফরাসী সংবিধান স্বীকৃত।

ইটালীতে বিরাজিত প্রিফেক্টোরাল পদ্ধতিকে অসমন্বিত পদ্ধতির দৃষ্টান্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এখানে প্রিফেক্টকে স্থানীয় সরকারের প্রধান প্রশাসক হিসাবেও দেখা হয় না এবং স্থানীয় সরকারী বিভাগের কর্মকর্তাগণকে প্রিফেক্টের মাধ্যমে উচ্চপর্যায়ে তাদের স্ব স্ব বিভাগের সাথে যোগাযোগও করতে হয় না। কিন্তু প্রিফেক্টকে ইটালীতেও রাজনৈতিভাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে স্বীকার করা হয়।

স্থানীয় শাসন ও মাঠ প্রশাসনের সামগ্রিক ইতিহাস বিবেচনা করলে বাংলাদেশের জেলা প্রশাসনের উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে প্রিফেক্টরাল পদ্ধতির সাযুজ্য অনেক বেশী। বৃটিশ আমলের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর প্রিফেক্ট থেকেও শক্তিশালী ছিল। যদিও বৃটিশগণ নিজ দেশে বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছেন কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার সকল উপনিবেশ গুলোতে তারা মূলতঃ ফরাসী প্রিফেক্টোরাল পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। পরবর্তীতে ১৯২০ সালে জেলা পরিষদকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার প্রচেষ্টা হিসাবে নির্বাচিত জেলা পরিষদ সভাপতির পদসৃষ্টি করা হলেও এ ব্যবস্থা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।[১৪] ভারতে অবশ্য জেলা পরিষদ বরাবরই নির্বাচিত সভাপতি ও পরিষদের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ১৯৬০ সন থেকে ডেপুটি কমিশনার হিসাবে পরিচিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা, কাজ ও ভূমিকায় ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। প্রশাসনের সাধারণী ও বিশেষজ্ঞের দ্বন্দ্ব বিশেষতঃ ক্যাডার

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার সাময়িকী

ভিত্তিক আন্দোলনের কারণে ডেপুটি কমিশনারের জেলা পর্যায়ে সমন্বয়কারীর ভূমিকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আইনগতভাবে ডেপুটি কমিশনার জেলার পুলিশ প্রধান হলেও তার কার্যকারিতা বাস্তব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে নতুন উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী পূর্বতন থানাসমূহে উপজেলা পরিষদ গঠিত হবার পর ডেপুটি কমিশনার ও অন্যান্য জেলা পর্যায়ের বিভাগগুলোর ক্ষমতা আরও সীমিত হয়ে পড়েছে।

তাই ভবিষ্যতে জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রশাসন, সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসমন্বিত করার জন্যে মাঠ প্রশাসনের পুর্নবিন্যাসের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠ প্রশাসনের তত্ত্বীয় বিষয়গুলোর পর্যালোচনা অতীব জরুরী। সে সাথে বাংলাদেশে বর্তমানে বিরাজিত মাঠ প্রশাসন কাঠামোর ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাটিও পাশাপাশি পর্যালোচনার দাবী রাখে। বর্তমান প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনের সনাতনী ভূমিকায় রুপান্তর ঘটছে এবং থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন প্রশাসনের গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে। জেলা সদরগুলোতে শিল্পায়ন ও নগরায়ন প্রসার হওয়ার পাশাপাশি সেখানে শক্তিশালী নগর পরিষদ বা পৌরসভাসমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এসব কারণে জেলা ও থানা পর্যায়ের মাঠ প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

দুই. বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ঃ ঐতিহাসিক বিবর্তন

অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান ১৯৮২ সাল লিখিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে লোক প্রশাসনে বাংলাদেশকে আবিষ্কারের একটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য প্রয়াস চালান।[১৫] তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ভূখন্ড তথা উপমহাদেশে রাষ্ট্রচিন্তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস এবং রাষ্ট্রযন্ত্র তথা প্রশাসন ব্যবস্থার একটি আদল পাওয়া যায়, যা আমাদের বর্তমান মাঠ প্রশাসন কাঠামোর ঐতিহাসিক বিবর্তন শীর্ষক আলোচনার মূল ভিত্তি রচনা করেছে। তিনি প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও স্বাধীন রাজাদের আমল, মুসলমান আমলের মধ্যে সুলতানী, মোঘল ও নবাবী আমল এবং সর্বশেষ বৃটিশ আমলের স্থানীয় শাসনের আলোচনায় দেখতে পান যে, মুলতঃ প্রদেশ/বিভাগ/জেলা/মহকুমা, থানা/সার্কেল, গ্রাম/মৌজা এই কয়টি ভৌগোলিক বিভাজনে এদেশের প্রশাসনিক এককের ঐতিহ্য প্রায় ২৫০০ বছরের পুরানো। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নামের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মূল বিষয় প্রায় অপরিবর্তিতই রয়েছে বলা যায়। অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান প্রণীত বাংলাদেশের লোক প্রশাসন ও প্রশাসক শীর্ষক ছকটি এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হিসেবে দেখা যেতে পারে (ছক-১)।

ছক–১ বাংলাদেশের লোক প্রশাসন ঃ প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসক

হিন্দু আমল		মুসলমান আমল (সুলতানী)		মুসলমান আমল (মোঘল/নবাবী)		বৃটিশ আমল (১৭৮০-১৯৪৭)	
প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক	প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক	প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক	প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক
ভুক্তি	উপরিক	ইকলিম	ওজরী	সুবা	সুবেদার/নাজিম	প্রদেশ/বিভাগ	গভর্ণর/কমিশনার
বিষয়	বিষয়পতি/কুমারমাত্য	আরশা	শার-ই-লস্কর	সরকার/ চাকলা	ফৌজদার	জেলা	ডিসি/ডিএম/কালেক্টর
মন্ডল/বীথি	অধিকরণিক	শহর	ঐ	পরগণা	শিকদার	মহকুমা	এসডিও
গ্রাম	গ্রামপতি/গ্রামিক মহাত্তার	কসবা খিট্টা	ঐ	থানা	থানাদার	সার্কেল/থানা ইউনিয়ন/গ্রাম	সিও/ওসি

বৃটিশ আমল থেকে স্থানীয় প্রশাসনিক এককের সমপর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। সে প্রবণতাটি এখনও চালু আছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি প্রশাসনিক একককে প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এখানে বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে স্থানীয় প্রশাসনিক এককের পাশাপাশি চালুকৃত স্থানীয় সরকার ইউনিয়নগুলোর একটি তালিকা ছক-২ এ দেয়া হলো।

ছক-২ : বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তর/একক ও স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক বিবর্তন ১৭৯৩-১৯৯৮

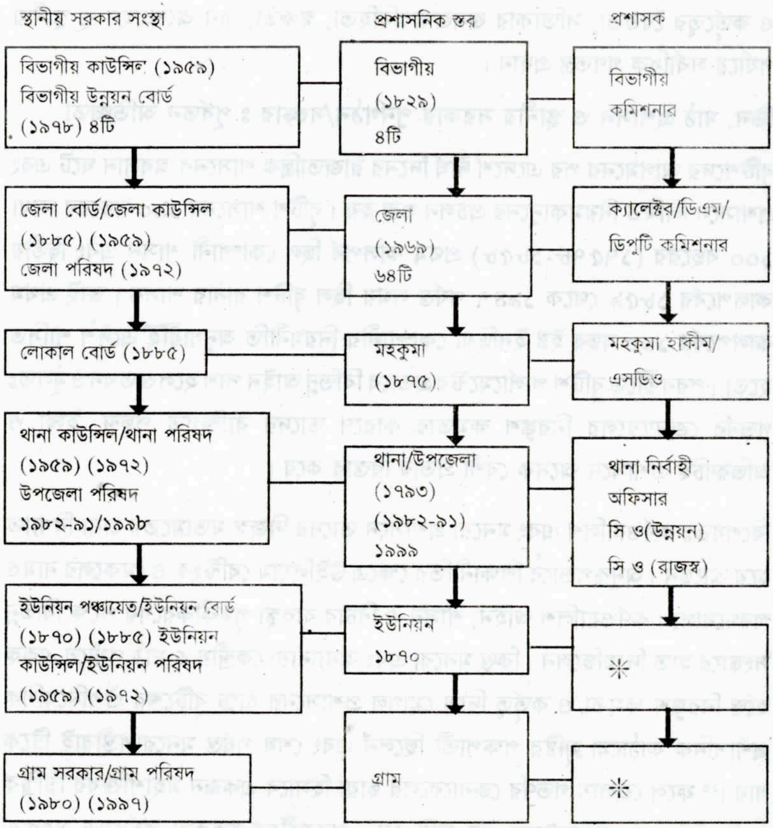

* ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড এবং গ্রাম পর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রশাসক নেই। তবে বিভিন্ন বিভাগের কিছু মাঠ কর্মী রয়েছে। প্রতিটি বক্সে নির্দেশিত সন ঐ স্তরটি শুরুর সন বা বছর হিসাবে ধরে নেয়া যায়।

স্থানীয় প্রশাসন তথা মাঠ পর্যায়ের জন প্রশাসনের বিবর্তনের প্রায় আড়াই হাজারের বছরের ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আমাদের আজকের বিভাগ, জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম যথাক্রমে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলের ভুক্তি, বিষয়, মন্ডল, বীথি ওগ্রামেরই প্রতিরূপ। তাই প্রশাসনের ভৌগোলিক বিভাজনে আমাদের মৌলিকত্ব একেবারেই নেই। তবে কার্যপরিধি, সাংগঠনিক এবং জন সাধারণের অন্তর্ভুক্তির কথা বিবেচনা করলে বৃটিশ আমল থেকে সূচিত পরিবর্তনগুলো মৌলিক ও যুগান্তকারী। বিশেষতঃ বৃটিশ আমল থেকে স্থানীয় সরকার কাঠামোর সূত্রপাতের বিষয়টি পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। এখনও আমাদের মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের যে সমস্যা আধুনিক বিকেন্দ্রীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান করা সম্ভব হয়নি তা হচ্ছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দ্বৈততা, সত্যিকার জনজবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, জন অংশগ্রহণ ও স্থানীয় পর্যায়ে সর্বাধিক গণতন্ত্র প্রদান।

তিন. মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার পুর্নগঠন/সংস্কার ঃ পূর্বতন অভিজ্ঞতা

বৃটিশদের আগমনের পর এদেশে দীর্ঘ দিনের রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে এবং প্রশাসনে লিখিত নিয়মকানুনের প্রচলন শুরু হয়। বৃটিশ শাসনের ১৯০ বছরের মধ্যে ১০০ বছরের (১৭৫৭৮-১৮৫৮) প্রথম কালপর্ব ছিল কোম্পানী শাসন এবং দ্বিতীয় কালপর্বের ১৮৫৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময় ছিল বৃটিশ রানীর শাসন। তাই প্রথম কালপর্বের ১০০ বছর ইষ্ট ইনডিয়া কোম্পানীর নিয়মনীতি অনুযায়ীই এদেশ শাসিত হতো। পরবর্তীতে বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রভাবে বিভিন্ন আইন পাশ হলেও তখনও মূলতঃ গভর্নর জেনারেলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার কারণে তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ, ইচ্ছা ও অভিরুচিই প্রশাসনে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

বিশেষতঃ কর্ণওয়ালিশ এবং মনরো প্রশাসনে তাদের নিজস্ব মতামতের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। অনুরূপভাবে শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে উইলিয়াম বেন্টিংক ও মেকলের নামও স্মরণযোগ্য। কর্ণওয়ালিশ আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা পৃথকীকরণের পক্ষে বিভিন্ন সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু মনরো এবং অন্যান্যরা কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে একক হস্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে মোগল প্রশাসনের ধাঁচে বৃটিশের ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মনরোপন্থীরাই টিকে যায়।[১৬] ফলে জেলায় গভর্ণর জেনারেলের ছায়া হিসাবে একজন মহাশক্তিধর ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরের পদ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে মহকুমা পর্যায়েও মহকুমা হাকীমের পদ সৃষ্টিসহ প্রশাসনে বিভিন্নমুখী সংস্কারের উদ্দ্যোগ নেয়া হয়। তবে বৃটিশগণ ১৮৫৭ সনের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে একটি দর্শন মেনে চলতো।

সেটা হচ্ছে যথা সম্ভব বড় ধরনের কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার এড়িয়ে যাওয়া। তাই শেষ পর্যন্ত সরকার বৃটিশ মশলা মিশিয়ে পূর্বের সকল কাঠামো ও অবকাঠামো দিয়ে যে গুরুপাক প্রশাসনিক ঘন্ট পরিবেশন করা হয় তা মূলতঃ মোগলাই। মোগলদের রেখে যাওয়া কাঠামোকে খুব সামান্যই তারা পরিবর্তন করেছেন। মোগল কাঠামোর উপরই মূলতঃ ভারতে বৃটিশ প্রশাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ এ পাকিস্তান ও ভারত দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হবার পর স্বাধীনতার তৃতীয় বছরের মধ্যে ভারতে সংবিধান লিখিত হয়ে গেলেও পাকিস্তানে ১৯৫৬ সনের পূর্বে তা সম্ভব হয়নি। আবার ১৯৫৬ সনে গৃহীত সংবিধান ১৯৫৮ সনে স্থগিত বা বাতিল হয়ে যায়। ১৯৬২ সনে সামরিক সরকার কর্তৃক একটি সংবিধান লেখানো হয় যা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। তাই পাকিস্তানের পুরো ২৩ বছর (১৯৪৭-১৯৭০) সময় রাজনীতি ও প্রশাসন কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা লাভে ব্যর্থ হয় এবং প্রশাসনে মূলতঃ বৃটিশ ধারাবাহিকতাই রক্ষা করা হয়।

১৯৭১ সন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করার পর এক বছরের কম সময়ে একটি সংবিধান রচনা করা হয় এবং স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নানাবিধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সে প্রচেষ্টাসমূহের অন্যতম হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে গঠিত প্রশাসনিক ও চাকুরী পুনর্গঠন কমিটি, বেতন ও চাকুরী কমিশন, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর থেকে ২৭/২৮ বছরে প্রায় দুই ডজন বিভিন্ন কমিটি/কমিশন কাজ করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় কোন ক্ষেত্রে প্রশাসনের কাঠামো, কার্য ও সেবাদান প্রক্রিয়ায় ঐসব কমিটি/কমিশনের প্রতিবেদনসমূহ মৌলিক কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। এমন কি পূর্বের অনেক কমিটি ও কমিশনের প্রতিবেদন গোপনীয় দলিলের মতো সরকারী নথিবন্দী অবস্থায় আছে। কিছু কিছু কমিটি ও কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও তার বাস্তব কার্যকারিতা নেই বললেই চলে। বর্তমান সময়ে কার্যরত প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের দুইজন চেয়ারম্যান স্বেচ্ছায় পদত্যাগের পর তৃতীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যম কমিশনের কাজ শুরু হয়েছে।* এ পর্যন্ত প্রায় ১৬টি বিষয়ে কমিশন তাদের সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করেছে। কিন্তু সুপারিশকৃত বিষয়সমূহের তালিকা দেখে মনে হয় কমিশন অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনের মৌলিক বিষয়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত

* দুইজন প্রাক্তন সচিব নুরুন নবী চৌধুরী ও কাজী ফজলুর রহমান পদত্যাগ করার পর অপর এক প্রাক্তন সচিব এ, টি, এম, শামসুল হককে একজন পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদায় কমিশনের সভাপতি নিয়োগ করা হয়। জনাব হকের নেতৃত্বে কমিটি নভেম্বর ১৯৯৭ইং থেকে দুই বছরের জন্য কাজ করছেন।

কম গুরুত্বপূর্ণ আমলাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ সুযোগ সুবিধা ও নিয়মনীতি নিয়ে অনেক বেশী সময় ব্যয় করেছে। যেমন পেনশন, শীর্ষ আমলাদের যানবাহন সুবিধা, সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীর বয়স, অবসর ইত্যাদি।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এ যাবত যতগুলো কমিটি/কমিশন কাজ করেছে তার মধ্যে দুটি কমিশনের প্রতিবেদনকে গবেষণামান, সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনীতি ও প্রশাসনে মৌলিক পরিবর্তন আনার ইঙ্গিতবাহী হিসাবে অন্য সবার উর্ধ্বে স্থান দেয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে ১৯৭২ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বনামধন্য শিক্ষক ও উপাচার্য অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্ব গঠিত Administrative and Services Reorganization Committee (ASRC) বা চৌধুরী কমিটি[১৭] ও ১৯৮২ সনের ২৮শে এপ্রিল রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খানের সভাপতিত্বে গঠিত The Committee for Administrative Reorgangation/Reform (CARR) বা খান কমিটি।[১৮] চৌধুরী কমিটি ১৯৭৩ সনের অক্টোবর মাসের মধ্যে তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। খান কমিটি দুই মাসের কম সময়ের মধ্যে (২২শে জুন ১৯৮২) ২৬৮ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করে। এই দুটি প্রতিবেদন ছাড়া এ লক্ষ্যে আরও বহু কমিটি কমিশনের প্রতিবেদন এবং গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

অন্যান্য কমিটি কমিশনের অবদানকে খাটো না করেও এটুকু বলা যায় যে, প্রতিবেদনের গবেষণা মান ও বিষয়বস্তুর মৌলিকত্বের দিক থেকে এ দুটি প্রতিবেদন এদেশের প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান পেতে পারে। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের বিভিন্ন সংস্কার প্রচেষ্টার ভাল দিক এবং বাংলাদেশের স্বপ্নকল্পনার রূপায়ণে সহজ ও জটিলতা মুক্ত একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার রূপরেখা প্রণয়নে মোজাফফর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিশন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে সম্পন্ন করে। মূলতঃ দুটি কারণে এটি সম্ভব হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়, (১) তৎকালীন সরকার কমিশনের কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে কমিশনকে চিন্তা ও কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন; (২) মরহুম মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সততা, নিষ্ঠা ও পান্ডিত্য এই প্রতিবেদনের গুণগত পিছনে ছিল মূল নিয়ামক শক্তি।

বর্তমান সময়ের গঠিত কমিশনগুলো (শামসুল হক কমিশন-১৯৯৭) বহু আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, যা তখনকার কমিশন পায়নি। তারপরও তাদের দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও সততা সর্বোপরি বিষয়বস্তুর উপর সুগভীর পান্ডিত্য ঐ প্রতিবেদনকে

একটি ক্লাসিক ডকুমেন্টে পরিণত করেছিল। পরবর্তীতে এম এ খান কমিটির প্রণীত রিপোর্ট মূলতঃ চৌধুরী কমিটির প্রতিবেদনের ছায়া হিসাবেই তৈরী হয়। এ প্রতিবেদনেও যথেষ্ট পান্ডিত্য ও গবেষণার ছাপ দেখা যায়। এই দুই প্রতিবেদন শুধুমাত্র পান্ডিত্য ও গবেষণাধর্মিতার গুণে বিশিষ্ট তা নয়, বিষয়বস্তুর মৌলিকত্বও প্রতিবেদন দুটিকে পরবর্তী অনেক প্রতিবেদনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।

চৌধুরী কমিটি সচিবালয় পুর্নগঠন, কর্ম পদ্ধতি (Procedure of work), মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর পুর্নগঠন, জেলা ও অন্যান্য মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন, বেতন ও চাকুরী কাঠামো, বিভিন্ন সার্ভিস ক্যাডারের একত্রীকরণ ও পুর্নবিন্যাস (১৩টি কেন্দ্রীয় ক্যাডার ও ২৭টি প্রাদেশিক ক্যাডারসহ সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ) ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত বাস্তবসহ সম্মত সুপারিশ প্রণয়ন করে। চৌধুরী কমিটির সুপারিশসমূহের মধ্যে যা দেশের সরকারী কর্মচারী কাঠামোকে সুসংহত করেছে তা হচ্ছে বিভিন্ন বেতন স্কেল ও ক্যাডারকে একটি একক ব্যবস্থার অধীনে আনায়ন যা সত্যিকার অর্থে ছিল দুরূহ কাজ। ঐ কমিটি সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০ ধারাসমূহের আলোকে মাঠ প্রশাসনের স্তর এবং স্থানীয় সরকার কাঠামোর উপর অত্যন্ত স্বচ্ছ সুপারিশ প্রণয়ন করে। চৌধরী কমিটি দেশের সকল মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তর করা এবং বিভাগীয় স্তরের প্রশাসনিক একক বিলুপ্তির পক্ষে মত দেয়। জেলায় একটি শক্তিশালী প্রশাসনের সুপারিশসহ ডেপুটি কমিশনারের কর্ম পরিধির একটি নতুন রূপরেখা প্রণয়ন করে এবং জেলা, থানা ও ইউনিয়ন এই তিন স্তরে স্থানীয় সরকার গঠনের পক্ষে মতামত দেয়।

থানা পরিষদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়ার বিষয়টি ১৯৮২ সালে বাস্তবায়িত হলেও চৌধুরী কমিটিই প্রথমবারের মত কৃষি, গ্রামীণ প্রকৌশল, পশুসম্পদ, স্বাস্থ্য ও গ্রামীণ স্যানিটেশান, শিক্ষা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমবায়, মৎস্য উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি থানা পরিষদে স্থানান্তরের সুপারিশ করে। তা ছাড়া বিভাগ বা বৃহত্তর জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠনের ব্যাপারেও চৌধুরী কমিটির সুপারিশ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রতিবেদন সাধারণের পাঠ ও পর্যালোচনার জন্যে কখনও উন্মুক্ত করা হয়নি। এই রিপোর্ট পুনর্মূল্যায়ন করা হলে অনেক ক্ষেত্রে নতুন কমিটি গঠন করার প্রয়োজন পড়ে না। তাই প্রতিবেদনটির উপর বর্তমান কমিশন (শামসুল হক কমিশন) এর কাছ থেকে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন আশা করা যায়। খান কমিটির প্রতিবেদন সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এটি অনেক ক্ষেত্রে চৌধুরী কমিটি জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন

পুনর্বিন্যাসের যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করে তাকে ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেছে। চৌধুরী কমিটির মত এ কমিটিও মহকুমা ও বিভাগীয় স্তর বাতিলে সুপারিশ করে। বাংলাদেশের জনপ্রশাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে এই দুটি প্রতিবেদন গবেষণামান ও সুপারিশের বাস্তবতার নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চৌধুরী কমিটি (১৯৭৩) ও খান কমিটি (১৯৮২) ছাড়াও পরবর্তীতে গঠিত অন্য দুইটি স্থানীয় সরকার কমিশনের উপরও কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। কারণ প্রথমতঃ এই দুইটি কমিশনের রিপোর্টের বৃহত্তর অংশ বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার কাঠামোতে মারাত্মক কিছু অসঙ্গতি রয়ে যাচ্ছে যা ভবিষ্যত স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। তৃতীয়ত ঃ এই প্রতিবেদন ও প্রতিবেদনভিত্তিক বিভিন্ন আইন ও বিধিগুলোতে স্থানীয় সরকারকে প্রশাসন বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয়েছে। সামগ্রিক জনপ্রশাসনের জটিল সম্পর্ক এখানে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। এ দুটি প্রতিবেদনের প্রথমটি হচ্ছে তৎকালীন তথ্য মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে ১৯৯২ সালে গঠিত স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশনের প্রতিবেদন[১৯] ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে এডভোকেট রহমত আলী এম পির সভাপতিত্বে ১৯৯৭ সালে গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিবেদন।[২০] চৌধুরী কমিটি (১৯৭৩) ও খান কমিটির (১৯৮২) তুলনায় এ দুটি রিপোর্টের বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহের পিছনে গবেষণা সমর্থন (পূর্বে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মগুলোর কোন পর্যালোচনা) নেই বললেই চলে। যদিও সুপারিশসমূহের অধিকাংশ হয় ইতোপূর্বে বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা সমর্থিত বা নয়তো বিতর্কিত ছিল। কিন্তু কোনরূপ পর্যালোচনা বা পূর্বে কোন গবেষণাকর্মের কোন ধরনের উল্লেখই এ প্রতিবেদন দুটিতে নেই। দুটি প্রতিবেদনেই সমসাময়িক কালের সরকারের রাজনৈতিক মতামতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কমিশনের নিরপেক্ষ কোন অবস্থান বা প্রচলিত ভিন্নমতসমূহের নিজস্ব কোন মূল্যায়ন নেই। যেমন নাজমুল হুদা কমিশন ইউনিয়ন ও জেলা দুইস্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। কিন্তু তখনই দেশে উপজেলা স্তরের পক্ষে প্রবল জনমত ছিল এবং বিভিন্ন জরীপ ও গবেষণা কর্মে উপজেলা পদ্ধতি ও ইউনিয়ন পরিষদ এই দুই স্তরের পক্ষে একটি মতও বহুল ভাবে আলোচিত হচ্ছিল।[২১] তা ছাড়া কমিশন সরাসরি মহিলা সদস্য নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদের তিনটি ওয়ার্ডের পরিবর্তে নয়টি ওয়ার্ড করার পক্ষে যে মত দেন বিভিন্ন গবেষণা কর্মে ইতোপূর্বে এ মতের জোরালো সমর্থন ছিল। কমিশন ঐ সব গবেষণার কোন উল্লেখ না করেই ঐ গবেষণার ফলাফলসমূহকে সরাসরি সন্নিবেশ করে।[২২] তাছাড়া স্থানীয়

সরকারে সংসদ সদস্যের সম্পৃক্তি, গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো না করে গ্রামকে স্বেচ্ছাসেবী ও কমিউনিটি উদ্যোগের জন্যে উন্মুক্ত রাখার পক্ষেও জোরালো মতামত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়। যার কোন পর্যালোচনা বা উদ্ধৃতি কমিশন প্রতিবেদনে দেখা যায়নি।[২৩] এই জাতীয় একমুখিতা একটি কমিশন রিপোর্টের সম্পূর্ণতা ও নিরপেক্ষতাকে প্রশ্ন সাপেক্ষ করে তোলে এবং বিশ্বাসযোগ্যতা কমিয়ে দেয়।

রহমত আলী (১৯৯৭) কমিশনের প্রতিবেদনের পরিসর হুদা কমিশনের তুলনায় কিছুটা বিস্তৃত হলেও একই ধরনের সীমাবদ্ধতা থেকে এ প্রতিবেদনও মুক্ত হতে পারেনি। প্রতিবেদন পড়ে মনে হয় সুপারিশগুলো আগে থেকেই তৈরী ছিল, শুধু একটি কমিশন করে বৈধতা দানের প্রয়োজনে এই প্রতিবেদনটি লেখা হয়। সংবিধানের অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করে চার স্তর বিশিষ্ঠ একটি কাঠামো এ প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু দেশে প্রচলিত স্থানীয় সরকার বিষয়ক প্রায় সকল আলোচনা ও গবেষণায় চার স্তরের সমর্থন পাওয়া যায়নি। তেমনিভাবে সংবিধানের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় প্রশাসনিক স্তর, কাঠামো এবং সংসদ সদস্যদের ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে সমসাময়িক গবেষণা ফলাফল ও সুপারিশসমূহের কোন আলোচনা এ প্রতিবেদনে নেই। শেষোক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ সংক্রান্ত আইন ইতোমধ্যে পাশ হয়েছে। সংসদে এবং সংসদের বাইরে এ সব আইন নিয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা না হওয়ায় কারণে নতুন স্থানীয় সরকার তার আকাঙ্ক্ষিত শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হয় না।

চার. মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার ঃ একুশ শতকের ভাবনা

৪.১ মাঠ প্রশাসন ঃ

এই প্রবন্ধের পূর্ববর্তী অংশের আলোচনায় বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠ প্রশাসনের তত্ত্বীয় আলোচনার সাথে বাংলাদেশের বিরাজিত বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তুলনা করলে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা বা একটি সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া খুবই কঠিন। বর্তমান বাংলাদেশে মাঠ প্রশাসন নামক একীভূত বা একক কোন কাঠামো নেই। জেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসন বলতে একসময় নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেসী, ভূমি ও ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের সকল ধরনের সাধারণ অভিযোগ শোনার একমাত্র ব্যবস্থা হিসাবে জেলা প্রশাসনকে বুঝানো হতো। জেলা প্রশাসন তথা কালেক্টরেট নামক একটি সরকারী ভবনকে জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গণ্য করা হতো। জেলা প্রশাসক সাধারণ প্রশাসন ছাড়াও এক

ধরনের অছি বা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন। জেলার সামগ্রিক প্রশাসনের মুখপাত্র এবং ঐক্যের প্রতীক হিসাবেই তাকে ধরে নেয়া হতো। বৃটিশ আমলে নির্বাহী, বিচার ও রাজনৈতিক ক্ষমতার একক অধিকারী হিসাবে এই পদটিকে গড়ে তোলা হয়। ক্ষমতার আইনগত ভিত্তি অত্যন্ত স্পষ্ট না হলেও অনানুষ্ঠানিক ও সনাতনী ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে জেলা প্রশাসনের দপ্তর ও বাংলোর খোলস থাকলেও সামন্তের দাপট এখন বিলুপ্ত। অপরদিকে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের চাহিদা অনুযায়ী যৌক্তিক আইন কাঠামোর আওতায় একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বিকল্প কাঠামোও সেখানে গড়ে উঠেনি। তাই জেলা প্রশাসনে এখনকার সংকট বহুমুখী। একদিকে সাধারণ জেলা প্রশাসন সনাতনী একটি সমন্বিত প্রিফেক্টরাল পদ্ধতির প্রাণহীন অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অপরদিকে জনপ্রতিনিধিত্বশীল বিকেন্দ্রীকৃত (Devolution) ব্যবস্থা সৃষ্টির দৃঢ় সাংবিধানিক অঙ্গীকার সত্ত্বেও সে ব্যবস্থা হালে পানি পাচ্ছে না। তাই একদিকে সনাতনী আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ অকেজো ও শিথিল অপরদিকে জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন, উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার কোন কাঠামো গড়ে উঠছে না।

অন্যদিকে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রশাসনে প্রত্যর্পণ পদ্ধতির (Delegation System) ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে এবং এই অপব্যবহার প্রশাসনের সামগ্রিক গতিধারাকে একটি ভিন্ন স্রোতে সামিল করেছে। যার পরিণতি সামগ্রিকভাবে জবাবদিহিমূলক ও গণমুখী সেবা কাঠামো গড়ে উঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় ৪০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনে রয়েছে শতাধিক সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, দপ্তর ও অধিদপ্তর। এই সব দপ্তর-অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ বিভাগ, জেলা, থানা এমন কি তার নীচেও তাদের কার্যক্রম বিস্তার করে চলেছে। পাশাপাশি আবার এই সব দপ্তর ও অধিদপ্তর স্বল্পকালীন কিছু এলাকাভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্টি করে চলেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্প প্রশাসন। কেন্দ্রীয় সরকারের এইসব দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ জেলা ও থানা পর্যায়ে একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই জাতীয় সম্প্রসারণ ও বিস্তৃতি ভবিষ্যতের যে কোন ব্যয় সাশ্রয়ী ও জনসম্পৃক্তিমূলক মাঠ প্রশাসন কাঠামো এবং শক্তিশালী স্থানীয় সরকার সংস্থা গঠনের পথে বড় অন্তরায় ও হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিগত দুই দশক ধরে চতুর্থ একটি ধারাও বাংলাদেশের জনপ্রশাসনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে এবং ভবিষ্যতেও মাঠ প্রশাসনকে একটি বাস্তবসম্মত কাঠামোয় অধিষ্ঠিত করতে হলে সে চতুর্থ ধারাকে সামগ্রিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করে নিতে হবে।

সে চতুর্থ ধারাটি হচ্ছে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি। তাই বিকেন্দ্রীকরণে বিরাষ্ট্রীয়করণ ধারণার বাস্তব প্রয়োগ এখানে প্রয়োজন পড়বে।

তাই উপরোক্ত চারটি অংশীদারের উপস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতে মাঠ প্রশাসনের সকল ধরনের সংস্কারে যেতে হবে। সে চারটি অংশীদার হচ্ছে আমলাতন্ত্র, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিশেষায়িত এজেন্সী কাঠামো তথা করপোরেশন, অধিদপ্তর, বোর্ড ইত্যাদি এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা বা অন্যান্য সিভিল সোসাইটি সংগঠন। বর্তমান এই চারটি অংশীদার ভারসম্যপূর্ণ কোন একক ব্যবস্থার অধীনে কাজ করছে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তিতে প্রশাসন, উন্নয়ন, সেবাদান ইত্যাদিকে খেয়াল খুশী মত ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা পরস্পর বিরোধী ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হচ্ছে। এই বিষয়টির নিষ্পত্তি বর্তমানকার মাঠ প্রশাসনের একটি প্রধানতম বিষয় হওয়া উচিত। এই বিষয়টির নিষ্পত্তি বা সমাধানের প্রধান সূত্র হওয়া উচিত বিভাগ, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন এই সকল পর্যায় বা স্তরের যে কোন একটিকে প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু (ocal point) হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া। তারপর সে কেন্দ্রবিন্দুর সাথে প্রান্তীয় সংগঠনসমূহকে সম্পর্কিত করা। কেন্দ্রবিন্দু নির্ণীত হবার পর সে কেন্দ্রবিন্দুর কেন্দ্রীয় প্রশাসক কে হবেন এবং কীভাবে হতে পারেন সেটি নির্ধারণ করা যাবে। বিকেন্দ্রীকরণের চারটি ভিন্ন প্রকার ও পদ্ধতি এবং মাঠ প্রশাসনের তত্ত্বের তিনটি মতের পর্যালোচনা করে দেশীয় প্রয়োজন ও ঐতিহ্যের নিরিখে তা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

বর্তমানে আমাদের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে কোন কেন্দ্রবিন্দু কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং মনিটর কোনটাই নেই। প্রত্যেকটি বিভাগ, দপ্তর অধিদপ্তর স্ব স্ব বিভাগীয় সদর দপ্তরের কাছ থেকেই সিদ্ধান্ত পায়। মাঠে সত্যিকার অর্থে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না। সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন এবং সফলতা বা বিফলতার সঠিক কোন মূল্যায়নও হয় না। এখন প্রশ্ন দেখা দিবে মাঠপর্যায়ের প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুটি কোথায় কোন স্তরে হবে? ইতোপূর্বে ১৯ ০ সনের পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি বিভাগ পর্যায়ের প্রশাসনিক একক বাতিলের সুপারিশ করেছে। তাই বিভাগের প্রশ্নটি পুনরায় নতুন করে আলোচনা অবান্তর। জেলা ও থানার মধ্যে বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ করা যায়। জেলা সুদীর্ঘ ২০০ বছরের বেশী সময় ধরে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও কোন সমন্বিত ব্যবস্থার অধীনে না হলে ও জাতীয় বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নীচে জেলা স্তরকেই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তর বা একক মনে করা হয়। তাই জেলা স্বাভাবিক ভাবেই মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায়। কিন্তু

বিগত দুই দশকে জেলা ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থানা যথা উপজেলা পর্যায়ে স্থানান্তর করে কিছুটা সুফল পাওয়া গেছে। উপজেলা এখন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে জেলার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। তাই জেলা প্রশাসন ও পরিবর্তিত অবস্থায় উপজেলা পদ্ধতির সামগ্রিক মূল্যায়ন করে এ ব্যাপারে একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হবে। দীর্ঘ দিন ধরে আমাদরে দেশের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন বলতে সাধারণত থানা ও জেলা স্তরকেই বুঝানো হতো। বিভাগ ও মহকুমা স্তর সব সময়ই থানা ও জেলার তুলনায় নিষ্প্রভ ছিল। ইতোমধ্যে মহকুমা বিলুপ্ত হয়ে জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রশাসনে অপচয় রোধ, অর্থ সাশ্রয় ও জনবল বিন্যাসের জন্যে বিভাগীয় স্তরটিও বাতিল করা প্রয়োজন।

থানা ও জেলার মধ্যে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিত ও চাহিদা অনুযায়ী জেলাকে নিম্নস্তরের সকল সংস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা সমন্বয়ের এবং থানাকে সরকারের সকল কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জ্যোতিকেন্দ্রে হিসাবে গড়ে তোলা উচিত। বর্তমানকার জেলা ও উপজেলার ভৌত অবকাঠামো, জনবল, সিভিল সোসাইটি সংগঠন এবং সর্বোপরি জনপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো সবদিক দিয়ে এই জ্যোতিকেন্দ্র হবার উপযোগিতা এই দুইটি স্তরেই রয়েছে। তা ছাড়া ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সন পর্যন্ত উপজেলা পদ্ধতির একটি বাস্তব পরীক্ষাও হয়েছে।

জেলা একদিকে কেন্দ্র ও মাঠ প্রশাসনের সংযোগ, অপরদিকে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মনিটরিং, তত্ত্বাবধান ও কারিগরি সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তা ছাড়া উপজেলায় হস্তান্তরিত এবং হস্তান্তরিত নয় এমন বিষয়গুলোর কার্যক্রম সমন্বয়ে জেলা প্রশাসন জেলা পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে জেলা প্রশাসন বলতে যা বুঝায় তা জেলায় কর্মরত সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মকান্ড নয়। শুধুমাত্র ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের অধীনস্থ দপ্তরসমূহ নিয়েই বর্তমানে জেলা প্রশাসন। জেলায় বিচার, রেগুলিটরী, উন্নয়ন ও সেবামূলক এই চারটি বৃহত্তর বিভাজনে বৃহত্তর সরকারী বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্র রয়েছে। জেলা প্রশাসনের নির্বাহী বিভাগের সাথে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের একটি বড় অংশ বহু বছর ধরে যুক্ত রয়েছে। সে বিচার বিভাগীয় কর্মকাণ্ড থেকে নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাদের মুক্ত করে দিতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেসী পুরোপুরি জেলা জজের অধীনে চলে যাওয়া উত্তম। এটি আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকারও বটে।[২৪] তাই জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেসী বিচার বিভাগের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। বরঞ্চ তখন জেলা প্রশাসন সত্যিকার অর্থে নির্বাহী কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে। জেলায় কর্মরত সকল

বিভাগ, অধিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সকলেই সমন্বিতভাবে জেলা প্রশাসনের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হবে। একটি একক ব্যবস্থাধীনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা হবে।

মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের দ্বন্দ্বও এক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান প্রশাসনিক ও প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন দুইটির সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার পথে একটি অন্যতম অন্তরায়। প্রশাসনিক ইউনিটে কর্মরত বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা ও একই ইউনিটের স্থানীয় সরকারকে একই কার্যতালিকা দেয়া হচ্ছে। যেমন, কৃষি উন্নয়ন মূলতঃ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কাজ এবং এ কাজের জন্যে তাদের প্রয়োজনীয় জনবল, দক্ষতা ও অর্থ সম্পদ রয়েছে। মাঝখানে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায়ও কৃষি উন্নয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু এজন্যে স্থানীয় পরিষদগুলোর কোন অর্থ, জনবল ও দক্ষতা নেই। তাই স্থানীয় সরকার প্রকৃত পক্ষে কৃষি উন্নয়নের দায়িত্ব পাওয়া সত্ত্বেও কোন কাজই করতে পারে না। এ রকম ভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পয়নিস্কাশন সহ বহুবিধ কাজের ক্ষেত্রে বিষয়টি সত্য। তাই একই পর্যায়ে প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার ইউনিটে একই কার্যক্রমের দায়িত্ব দুইটি প্রতিষ্ঠানকে দিলে স্বাভাবিকভাবেই জটিলতা সৃষ্টি হবে। তাই স্থানীয় সরকার সংস্থা ও বিশেষায়িত সরকারী দপ্তরের কার্যপরিধির সুনির্দিষ্টকরণ প্রয়োজন।

পরিস্কার বিভাজন থাকাও প্রয়োজন। সবচেয়ে ভাল হয় একই প্রশাসনিক একাংশে সমান্তরালভাবে দুটি প্রতিষ্ঠানকে পাশাপাশি না রেখে যে কোন একটিকে কাজ করতে দেয়া।

তবে এক্ষেত্রে মাঠ প্রশাসন তত্ত্বে উল্লেখিত তিনটি পদ্ধতি পুনঃ আলোচনা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমরা বৃটিশ, আমেরিকান, ফ্রান্স বা ইটালীয়ান কোন মডেল অনুসরণ করব? উপজেলা পরিষদের বর্তমান কাঠামোতে বৃটিশ, আমেরিকান এবং ইটালিয়ান মডেলের মিশ্রণ রয়েছে। মিশ্রণের কারণে দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। বর্তমানকার উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী নির্বাচিত চেয়ারম্যানই উপজেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী হবেন।[২৫] এই আইনে উপজেলা পরিষদের ১৮টি কার্যবালীর উল্লেখ রয়েছে এবং ১০টি মন্ত্রণালয়ের থানা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরী পরিষদের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে।[২৬] এ ক্ষেত্রে থানায় ভূমি, রেজিষ্ট্রেশন (সাব-রেজিস্ট্রার), স্বরাষ্ট্র (পুলিশ ও আনসার), খাদ্য, মাধ্যমিক শিক্ষা, শিল্প (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প), সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ এই

ব্যবস্থার বাইরে অবস্থান করছেন। এ ক্ষেত্রে পরিষদের বাইরে অবস্থানরত মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে পরিষদের এবং ঐ কর্মকর্তাদের অবস্থান কখনও সংশয়মুক্ত হবে না। আবার যে সব মন্ত্রণালয়ের জনবল ও কার্যক্রম ন্যস্ত হলো তারাও এক ধরনের দ্বৈত শাসনের আওতায় থাকবে। তাদের নিজ নিজ বিভাগ ও পরিষদ দ্বৈতভাবে তাদের উপর কর্তৃত্ব করবে। তবে শেষ পর্যন্ত বিভাগীয় কর্তৃত্বই বহাল থাকবে। আর অন্য দিকে স্থানীয় সংসদ সদস্যের ভূমিকাও পরিষদকে ভিন্ন একটি বাঁধনে আবদ্ধ করবে। কারণ উপজেলা আইন ১৯৯৮ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, পরিষদ উপদেষ্টা তথা এম পির পরামর্শ গ্রহণ করিবে।[২৭] গ্রহণ না করলে কি হবে সে কথাটি বলে না দিলেও সহজে অনুমেয়। এই অবস্থায় উপজেলা পরিষদ ও উপজেলার মাঠ প্রশাসন কোথায় দাঁড়াবে বা কোন ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত হবে তা পরিষ্কারভাবে বুঝা না গেলেও ধারণা করা যায় যে, দ্বৈততা ও ত্রৈততার আবর্তে প্রতিষ্ঠানিকতা বিনষ্ট বা বাধাগ্রস্ত হবে। জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে একটি পরিষদ গঠন করা হলেও সংসদ সদস্যের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, সরকারী কর্মচারীদের উপর খবরদারির অত্যন্ত শিথিল ব্যবস্থা, থানার বেশকিছু বিভাগকে পরিষদের জবাবদিহিতার বাইরে রাখা ইত্যাদিসহ উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ২৫টি বিভিন্ন ধারা ও উপধারায় কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায় থেকে সরাসরি হস্তক্ষেপের স্পষ্ট বিধান রাখা হয়েছে।[২৮]

জেলায় বর্তমানে কোন জন প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান না থাকায় সেখানে অবস্থাটি এখন এমন যেন মাথা নেই তাই মাথা ব্যাথাও নেই। উল্লম্ব (Vertical) বা উপর নীচ বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ পূর্বের মত বহাল আছে। আনুভূমিক (horizontal) যোগাযোগ ও সমন্বয় খুবই ক্ষীণ। জেলা প্রশাসকের সমন্বয় সভায় পূর্বতন একটি রেওয়াজ এখনও আছে, তবে কোন মন্ত্রী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করলে সভায় ভাল সমাগম হয়। নতুবা জেলার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ সভাসমূহে অনুপস্থিত থাকে। তাই উপজেলা পর্যায়ের ডিভলিউশেন এর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পর্যায় নিয়েও নতুনভাবে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। জেলায় কর্মরত বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলার কর্মরত এনজিওসমূহকে নিয়ে প্রস্তাবিত একটি জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের গঠন এবং ঐ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ও কার্য পদ্ধতির একটি রূপরেখা অনত্র দেখা যেতে পারে।[২৯] প্রস্তাবিত জেলা পরিকল্পনা বই এর কাঠামোটি ছক ৩-এ দেখা যেতে পারে।

গ্রন্থাগার সাভার,

ছক-৩ প্রস্তাবিত জেলা পরিকল্পনা বই এর কাঠামো

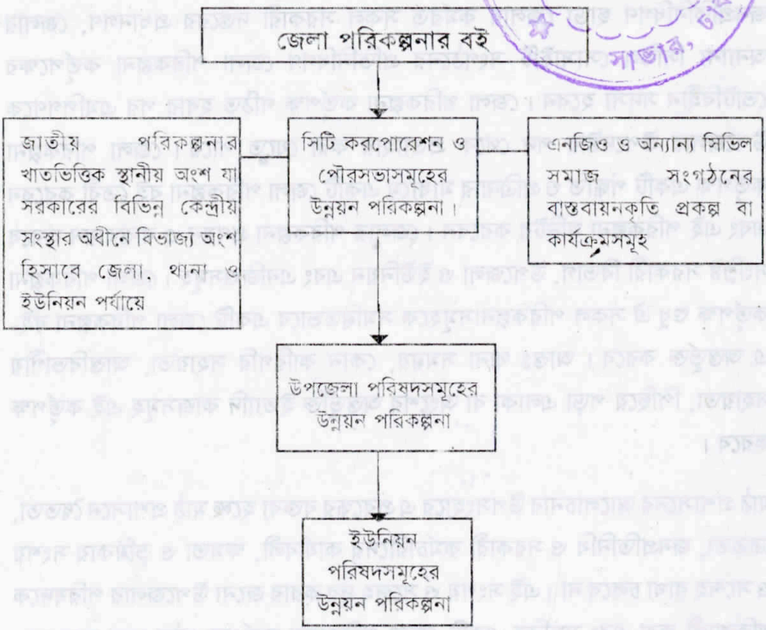

উৎস ঃ Ahmed, Tofail and Islam, M. Nurul (1995)

জেলা পর্যায়ে বর্তমান নতুনভাবে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় ও অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।[৩০] চৌধুরী কমিটি (১৯৭৩), বিচারপতি শাহাব উদ্দিন সাহেবের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং বার্ডের (কুমিল্লা) বিভিন্ন গবেষণায় জেলা পর্যায়ের নতুন করে স্থানীয় সরকার গঠন না করে একটি পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

এই জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ জেলার সকল এম পি এবং উপজেলার নির্বাচিত চেয়ারম্যান নিয়ে গঠিত হবে। এমপিদের মধ্য থেকে একজন এম পি উপজেলা চেয়ারম্যানদের এবং অন্যান্য এম পিদের ভোটে জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। বর্তমান জেলা পরিষদ ভবনটি জেলা পরিকল্পনা

কর্তৃপক্ষের দপ্তর হিসাবে ব্যবহৃত হবে। জেলা পরিষদের অন্যান্য সম্পত্তি জেলার অধীনস্ত পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদগুলোর মধ্যে বন্টন করে দেয়া যেতে পারে। জনপ্রতিনিধিগণ ছাড়া জেলায় কর্মরত সকল সরকারী দপ্তরের প্রধানগণ, জেলার অন্যান্য সিভিল সোসাইটি সংগঠনের প্রতিনিধিগণ জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের ভোটবিহীন সদস্য হবেন। জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠিত হবার পর এমপিগণকে উপজেলার উপদেষ্টার পদ থেকে প্রত্যাহার করা যেতে পারে। জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ একটি পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জেলা পরিকল্পনা বই তৈরী করবেন এবং এই পরিকল্পনা মনিটর করবেন। জেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ, উপজেলা ও ইউনিয়ন এবং এনজিওসমূহ। জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ শুধু ঐ সকল পরিকল্পনাসমূহকে সমন্বিতভাবে একটি জেলা পরিকল্পনা বই-এ অন্তর্ভূক্ত করবে। আন্তঃ থানা সমন্বয়, কোন কারিগরি সহায়তা, আন্তবিভাগীয় সহায়তা, পিছিয়ে পড়া এলাকা বা অংশের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি কাজসমূহ এই কর্তৃপক্ষ করবে।

মাঠ প্রশাসনের আলোচনার উপসংহারে এ প্রবন্ধের বক্তব্য হচ্ছে মাঠ প্রশাসনে দ্বৈততা, ত্রৈততা, জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মচারীদের কার্যাবলী, ক্ষমতা ও ভূমিকায় সংশয় ও সন্দেহ রাখা চলবে না। এই সংশয় ও সন্দেহ দূর করার জন্যে উপজেলার পরিষদকে শক্তিশালী করা এবং সমন্বিত একটি জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠন করা হলে ভাল সুফল পাওয়া যেতে পারে। উপজেলার উপর আর কোন স্থানীয় সরকার ইউনিট থাকার প্রয়োজন নেই।

জেলা হবে মাঠ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। উপজেলা হবে স্থানীয় সরকারের জ্যোতিকেন্দ্র। জেলা ও থানা পর্যায়ে একই ধরনের কাজ করার জন্যে বর্তমানে একাধিক বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও অধিদপ্তর কাজ করছে। যার ফলে কার্যপরিধি নিয়ে সংশয়, সন্দেহ, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা এবং সম্পদের অপচয় হচ্ছে। অপরদিকে একই ধরনের কাজ আবার এনজিওরাও করছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে স্থানীয় সরকার, সরকারী বিভাগ ও এনজিও এর মধ্যে সমন্বয়ের জন্যে অনেক দপ্তর ও অধিদপ্তরের একীভূতকরণ প্রয়োজন। সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমাজসেবা, মহিলা, যুব, প্রভৃতি অধিদপ্তর একীভূত হতে পারে। তাতে মূল্যবান সম্পদের সাশ্রয় হবে এবং প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে ইউনিটি অফ কমান্ড প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। জেলা ও থানা ছাড়া উপরে বিভাগ এবং নীচে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী সম্প্রসারণ না করে কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানের তথা ইউনিয়ন পরিষদ, সমবায়, এনজিও

প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপর বিভিন্ন দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া যায়। তা হলে সরকারের আকার আকৃতি ও ব্যবস্থাপনা সামর্থের দক্ষ ব্যবহার হওয়া সম্ভব।

৪.২ স্থানীয় সরকার

স্থানীয় সরকারের বৃত্তাবদ্ধতা

বৃটিশ ভারতের প্রায় দুইশত বছর এবং পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসকে বাদ দিয়েও স্বাধীন সার্বভৌম গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ২৭টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় সরকার অংগনের বৃটিশ বৃত্তাবদ্ধতা এতদিনেও অতিক্রান্ত হয়নি এবং স্থানীয় সরকারের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে এতগুলো বছর পরেও রাজনীতিবিদ, আমলাতন্ত্র, গবেষক, চিন্তাবিদ ও সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনার মেলবন্ধন ঘটেনি। এই মেলবন্ধনহীনতা বা প্রশাসনিক পরিভাষায় সমন্বয়ের অভাব এ দেশের স্থানীয় সরকার বিষয়ক চিন্তা ও কর্মের বৃত্তাবদ্ধতাকে একটি স্থায়ী রূপ ও কাঠামোয় অভিষিক্ত করতে যাচ্ছে। রাজনীতিবিদগণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে তাদের রাজনীতি চর্চার একটি কৌশলগত অস্ত্রের অতিরিক্ত কিছু এ পর্যন্ত অন্তত ভাবেননি। আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে তাদের প্রভাবকে অক্ষুন্ন রেখেই স্থানীয় সরকারের সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। গবেষক চিন্তাবিদদের প্রভাবশালী অংশ হয়ত জনবিচ্ছিন্ন নতুবা ক্ষমতাশালী আমলা-রাজনীতিবিদদের প্রভাব বলয়ভুক্ত। সর্বশেষ পক্ষ জনগণ। তাদের অবস্থা অনেকটা পিংপং বলের মত। সরকার বদল মানে খেলোয়াড় বদল। পুরোনো খেলা নতুন নামে শুরু হওয়া। এই হচ্ছে এ দেশের স্থানীয় সরকারের ভাগ্য বা দুর্ভাগ্য।

বৃত্তাবদ্ধতার স্বরূপ ও বিস্তৃতি

বৃত্তাবদ্ধতা বা দুষ্টচক্রের (Vicious circle) এই অচলায়তন আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বত্র। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থা এ অচলায়তানে বন্দি। তবুও মাঝে মাঝে ভেতর ও বাইরের অনেক ধাককা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় কিছু কিছু পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তোলে। সে ভাবেই হয়ত আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ও কর্মকান্ডে অনেক পরিবর্তন ধীরে হলেও সংগঠিত হচ্ছে। কিন্তু রাজনীতি ও প্রশাসনে সে পরিবর্তনশীলতার ছোঁয়া খুবই কম। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রাজনীতি ও প্রশাসনের একটি উপ-ব্যবস্থা (Sub-system) মাত্র। তাই এখানে বৃত্তাবদ্ধতার সংকট আরও গভীর।

স্থানীয় সরকারের বৃত্তাবদ্ধতাকে বুঝতে হলে সে বৃত্তাবদ্ধতার উপাদানগুলোকে ভালভাবে বুঝতে হবে। সে উপাদানগুলো মোটামুটি নিম্নরূপঃ

(১) ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক উত্তরাধিকার এবং সে উত্তরাধিকারের সম্পূরক ও পরিপূরক প্রচলিত আইন কাঠামো।

(২) রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং রাজনীতিকদের দুর্বলতা এবং

(৩) নাগরিক সমাজের যথাযথ ভূমিকার অভাব।

ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার

সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের সযত্ন লালন আমাদের স্থানীয় সরকার বিকাশের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের দুটি দিক রয়েছে। একটি প্রশাসনিক, অপরটি আইনগত। প্রশাসনিক দিকটি হচ্ছে বিভাগ, জেলা, থানা ইত্যাদি স্তরভিত্তিক প্রশাসন কাঠামো এবং ঐ কাঠামোগুলোতে আমলাতান্ত্রিকতার শতধারায় বিস্তৃতি। বৃটিশ আমলে অন্তত একটি সুবিধা ছিল যে, আমলাতন্ত্রের একটা চেইন অফ কমান্ড ছিল এবং প্রতিটি প্রশাসনিক একাংশে একজন প্রশাসকের একক কর্তৃত্ব ছিল। এখন আর তা নেই। এখন জেলা ও থানায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও করপোরেশনের আলাদ কাঠামো। বৃটিশরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য সাধারণ প্রশাসনের স্তর কাঠামো ও ক্ষমতাধর আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীন দেশে সে উত্তরাধিকারের সূত্র ধরে জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকার সবকিছুকে ঐ একই স্তর কাঠামোভিত্তিক আমলাতান্ত্রিকতার বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

আইন কাঠামোর ক্ষেত্রে দেখা যায় ভূমি আইন, প্রশাসনিক আইন, সিভিল ও পেনাল কোড এবং পুলিশ রেগুলেশন সব দিক থেকে আমরা এখনও সেই বৃটিশ আমলেই আছি। যুগ বদলায়, সমাজ বদলায়, বদলায় মানুষের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা। কিন্তু বদলায় না শুধু আইন। প্রশাসনের সর্বত্র এমন একটি অবস্থা দাঁড়ায় যেন আইনের প্রয়োজনেই মানুষ, মানুষের প্রয়োজনে আইন নয়। একটি উদাহরণ এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চলাফেরাকে সহজ, স্বচ্ছন্দ, নিরাপদ ও শোভন করার প্রয়োজনে মানুষ জুতা ব্যবহার করে। তাই সব-সময় পায়ের মাপে জুতা কেনা বা তৈরী হয়। কখনও সুদৃশ্য ছোট জুতায় প্রবেশ করানোর জন্যে পা কেটে ছোট করা হয় না। কিংবা সুন্দর বড় জুতার প্রয়োজনে ব্যবহারকারীদের পায়ে হাড় মাংস জুড়ে দিয়ে পা বড় করা হয় না। কিন্তু আমরা প্রশাসন, উন্নয়ন, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায়শই পা

কেটে জুতোস্থ করে যাচ্ছি। তাই দেখা যায় যখনই স্থানীয় সরকার সংস্কারের প্রশ্ন আসে তখনই অনিবার্যভাবে কিছু প্রসঙ্গ এসে পড়ে এবং যা মূল বিষয়টিকেই চাপা দিয়ে দেয়। যেমন,

→ স্থানীয় সরকারের উপর-নীচে কয়টি স্তর করা হবে;

→ এই স্তরগুলোকে কে বা কারা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে;

→ স্থানীয় আমলাতন্ত্রের সাথে স্থানীয় সরকারের কি সম্পর্ক হবে;

→ স্থানীয় সরকারে কার কি পদমর্যাদা হবে; এবং

→ ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের জন্য কী কী সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা যাবে।

আমি মনে করি স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনভিত্তিক মুক্ত চিন্তাকে আঁতুর ঘরে গলা টিপে ধরার জন্যে ঐ পূর্ব নির্ধারিত সীমাবদ্ধতাগুলোই যথেষ্ট। আমরা বিগত অনেককাল যাবত ঐ একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছি। আমাদের সংবিধানে উৎকীর্ণ স্থানীয় সরকার বিষয়ক অনুচ্ছেদ, বিভিন্ন সরকার প্রবর্তিত আইন, নিয়মনীতি, এ্যাক্ট এবং অধ্যাদেশ কোনটিই এর ব্যতিক্রম নয়।

স্থানীয় সরকার ও সংবিধান ঃ সীমাবদ্ধতার বিশ্লেষণ

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূলতঃ চারটি অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কথিত বিধানসমূহ রয়েছে। কিন্তু সংবিধানের ঐ বিধানসমূহ অস্পস্ট এবং দ্ব্যর্থবোধক। নিম্নে সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অংশগুলো উদ্ধৃত করা হলো ঃ

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশের (দ্বিতীয় ভাগ) ৯ এবং ১১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

"(৯) রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।"

"(১১) প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, সেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"

চতুর্থ ভাগের ৩য় পরিচ্ছেদের স্থানীয় শাসন শিরোনামের দুটি অনুচ্ছেদে যথাক্রমে ৫৯ এবং ৬০ এ বলা হয়েছে যে,

"৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। (২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেঃ-

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;

(খ) জনশৃংখলা রক্ষা;

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।"

"৬০। এই সংবিধানের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।"[৩১]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গৃহীত হবার পর ১৯৯১ সন পর্যন্ত সর্বমোট ১২টি সংশোধনী এতে আনীত হয়। সর্বশেষ সংশোধনীর পর ১১নং অনুচ্ছেদের শেষাংটি পুনস্থাপিত হওয়ায় "স্থানীয় শাসনের" একটি আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম একটি উদারনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান। কিন্তু প্রণয়নের তৃতীয় বর্ষ অতিক্রান্তির পূর্বেই প্রণেতাদের হাতে সংবিধানের উদার গণতান্ত্রিক নীতি-কাঠামোর খোল নলচে পালটে যায়। পরবর্তীতে সামরিক স্বৈরশাসকগণ কখনও স্থগিত কখনও পুনর্বহালের মাধ্যমে যে বেহাল অবস্থা সৃষ্টি করে তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে বাহুল্য মাত্র।

সংবিধানের যে ভিত্তির উপর স্থানীয় সরকারের বর্তমান ব্যবস্থা দাঁড়ানো বলে মনে করা হয় সে ভিত্তিও খুব স্বচ্ছ ও মজবুত নয়। তাই ১৯৯১ সনে সংবিধানের এ অনুচ্ছেদসমূহ পূর্ণভাবে বহাল হবার পরও ১৯৯৯ সনের বর্তমান সময় পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের একটি সর্বসম্মত কাঠামো ও কার্যাবলী চালু করা বাধা-বিঘ্নমুক্ত মনে করা যাচ্ছে না।

প্রথমতঃ ১১নং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় যাওয়া যেতে পারে। "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে"। এই সদিচ্ছার বাস্তবায়ন কিভাবে হচ্ছে বা হবে? প্রশাসনের সকল পর্যায় বলতে এখানে কি

বুঝানো হয়েছে, বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রশাসনের মূলতঃ দু'টি পর্যায় বা দিক, একটি ফাংশানাল দিক বা পর্যায়, অন্যটি হচ্ছে টেরিটোরিয়াল দিক। যেমন বিভাগ, জেলা, মহকুমা (এখন বিলুপ্ত), থানা, ইউনিয়ন, মৌজা, গ্রাম, শহর ইত্যাদি ভৌগোলিক একাংশ বা পর্যায়। আবার মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ফাংশানাল পর্যায়। তাই সংবিধান বর্ণিত 'জনগণের অংশগ্রহণ' কোন পর্যায়ে, বিভাগে হবে তার যথাযথ ব্যাখ্যা ছাড়া সকল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের ধারণাটি একটি wishful thinking ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ সংবিধানের চতুর্থভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫৯ অনুচ্ছেদের দফা (১) এ উল্লেখিত "প্রশাসনিক একাংশের" ধারণাটির সঠিক সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা ক্রটিমুক্ত নয়। সংবিধানের ১৫২(১) এ দেখা যায় যে, "প্রশাসনিক একাংশ অর্থ জেলা কিম্বা এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য কোন এলাকা"।[৩২] সাধারণতঃ বিভাগ, জেলা, মহকুমা ও থানা এদেশে বৃটিশ আমল থেকে প্রশাসনিক একাংশ হিসাবে স্বীকৃত। অবশ্য এ স্বীকৃতিরও কোন সাংবিধানিক ভিত্তি নেই। নিতান্তই প্রশাসনিক আয়োজন মাত্র। তাই আমাদের সংবিধানে প্রশাসনিক একাংশ বলতে কোন্ কোন্ স্তরের কোন্ ধরনের প্রশাসনকে বুঝানো হবে তারও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দরকার। নতুবা বিষয়টিকে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা দলগোষ্ঠি দ্বারা ইচ্ছামত সম্প্রসারণ ও সংকোচন করা হতে পারে।

তৃতীয়ত ঃ শহরাঞ্চল যেখানে পৌরসভা ও পৌর করপোরেশন গঠিত হয় বা গ্রামাঞ্চল যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম পরিষদ গঠিত হয় বা হতে যাচ্ছে ঐ পরিষদগুলো কি ইতোপূর্বে আদৌ কোন প্রশাসনিক একাংশ হিসাবে স্বীকৃত ছিল? বর্তমানে ঢালাওভাবে এগুলোকে একাংশ ঘোষণা করা হচ্ছে। প্রশ্ন হতে পারে ঐ একাংশের প্রশাসনিক অধিকর্তা কে এবং তাঁর/তাঁদের কী কী প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব রয়েছে? এই একাংশসমূহ প্রশাসনিক একাংশ হবার শর্তাদি পূরণ করেছে কিনা? ইদানিং কালে গ্রাম পরিষদ আইন ১৯৯৭ এ গ্রামকে এবং একইভাবে উপজেলাকে প্রশাসনিক একাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোপূর্বে অন্য কোন স্তরে অবশ্য তা করা হয়নি। তা হলে পূর্বে গঠিত ঐ পরিষদগুলো বিশেষ করে পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনগুলো প্রশাসনিক একাংশ না হয়েও টিকে আছে কিভাবে?

চতুর্থত ঃ ৫৯নং অনুচ্ছেদের দফা (২) ক, খ ও গ এ যে সব কার্যাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে সে সব কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব, ক্ষমতা, জনবল, অর্থ ইত্যাদি কখনও কি ঐ সব স্থানীয় সরকারকে দেয়া হয়েছে? ক্ষমতা জনবল ও অর্থ সরকারের আমলাদের

হাতে রেখে শুধু নামমাত্র দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং প্রতিক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসনের একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এই প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক আয়োজন সম্পর্কে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও ব্যাখ্যাকারদের মতামত কি? এখানে কি সাংবিধানিক বিধান লংঘিত হচ্ছে বলে মনে হয় না? আইন শৃংখলা, প্রশাসন, সেবা ইত্যাদির জন্যে সরকারী বাজেটের অর্থ খরচ করার অধিকারী ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে পৃথক পৃথক সরকারী প্রশাসনিক বিভাগের অধিকর্তাগণ। নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা এ ক্ষেত্রে নিতান্তই গৌণ। কিন্তু তাদের দীর্ঘ কার্য তালিকায় আইন শৃংখলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সকল কার্যক্রমের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ অবস্থাটি সংবিধানের লংঘন না পালন কি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে?

এখানে বৃত্তাবদ্ধতার প্রসঙ্গটি আবারও এসে পড়ে। যাঁরা দেশের সংবিধান প্রণয়নের মহান দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁরা সবাই অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উপর-নীচ কাঠামো বা পদসোপান এবং ঐ পদসোপানের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর আধিপত্যমুক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির বিষয়টি ঐ সময়ের ঐ পরিবেশে তাদের চিন্তাধারাকে নাড়া দেয়নি। তাই তারা প্রশাসনিক একাংশের সমান্তরালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির কথা বলেছেন। এমন কি 'স্থানীয় সরকার' শব্দটিও সংবিধানের বাংলা অংশে কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। বলা হয়েছে 'স্থানীয় শাসন' সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং লোকপ্রশাসন শাস্ত্রে 'স্থানীয় শাসন' ও 'স্থানীয় সরকারের' পৃথক ধারণা রয়েছে। ধারণাগত অর্থে এ দু'টি কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন বিষয়। তাই এখানেও যথাযথ ব্যাখ্যা বা নতুন শব্দ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। প্রশাসনিক একাংশের সাথে স্থানীয় সরকার সংস্থার গাটছাড়া বাঁধা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যক্রমে একটি মারাত্মক সীমাবদ্ধতা এনে দিয়েছে। তাই সংবিধানে প্রশাসনিক একাংশের বাঁধন থেকে স্থানীয় সরকারকে মুক্ত করে দিলেই স্থানীয় সরকারের স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হবে।

বিভিন্ন সংকট কালে সরকার ও বিরোধীদল সংবিধানকে উপস্থাপন করে নিজেদের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। বিগত ১৯৯১-১৯৯৬ সন পর্যন্ত বি এন পি সরকার জেলা ও থানা পর্যায়ে কোন নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাই চালু করেনি, সেটাকে সংবিধান লংঘনের ঘটনা হিসাবে তাদের কারও মনে হয়নি। আবার এখন আওয়ামী লগী সরকার সংবিধানের প্রশাসনিক একাংশের দোহাই দিয়ে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার করতে যাচ্ছেন। তাই সার্বিক বিবেচনায় একদিকে সংবিধানের স্থানীয় শাসন

বা স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিধি বিধানের যেমন পরিস্কার ব্যাখ্যা প্রয়োজন তেমনি বর্তমান সময়ের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং প্রয়োজনকেও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া উচিত। তাই যেখানে সাংবিধানিক বিধান অস্বচ্ছ এবং প্রয়োগযোগ্য নয় সেখানে সাংবিধানিক বিধানকে প্রয়োগযোগ্য, বাস্তবানুগ ও স্বচ্ছ করতে হবে। অপরদিকে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও দলের প্রয়োজনকে সামনে রেখে সাংবিধানিক নীতি অপপ্রয়োগের প্রচেষ্টাকেও রুখতে হবে। আমাদের সংবিধান সুপরিবর্তনীয়। দুনিয়ার কোন সংবিধানই সর্ব কালের সকল মানুষের জন্যে অকাট্য ও অভ্রান্ত দলিল নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে তাই সংবিধানের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধনী আনায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

সংবিধান ও স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক আলোচনায় একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সংবিধানে 'স্থানীয় সরকার' নামক শব্দটি কোথাও নেই। আমরা আমাদের আলোচনায় স্থানীয় সরকার নিয়ে যত কথাই বলি না কেন তার কোন সাংবিধানিক ভিত্তি নেই। কারণ সংবিধানে উৎকীর্ণ চারটি উদ্বৃত করা অনুচ্ছেদসমূহে ছয়টি বার 'স্থানীয় শাসন' ও 'প্রশাসন' শব্দাবলীই সংস্থাপিত রয়েছে। একটিবার কোথাও 'স্থানীয় সরকার' শব্দ উচ্চারিত হয়নি। সংবিধানের বাংলাভাষায় লিখিত অংশে 'স্থানীয় সরকার' শব্দ না থাকলেও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত অংশে স্থানীয় শাসনকে Local Government অনুবাদ করা হয়েছে। যা বাংলা ভাষার প্রচলিত পরিভাষা অনুযায়ী যথার্থ নয়। স্থানীয় শাসনের সঠিক অনুবাদ Local administration বা প্রয়োগভেদে Local rule হতে পারে, Local government কোনভাবে হতে পারে না। যেহেতু সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদের শেষাংশ বলা হয়েছে যে, ''বাংলা ও ইংরাজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।'' এখন অবশ্যই স্থানীয় শাসন ও Local government এর মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। কারণ স্থানীয় পরিষদের নামে পাশ করা বিভিন্ন আইন (উপজেলা আইন ১৯৯৮, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম পরিষদ আইন প্রভৃতি) মূলতঃ স্থানীয় শাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রণীত হয়েছে। শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের ধারণা বাস্তবক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাই সংবিধানের বাংলা অংশে 'স্থানীয় শাসনের' বদলে 'স্থানীয় সরকার' প্রতিস্থাপন করতে হবে। নতুবা সংবিধানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কোন ভিত্তিই পাওয়া যাবে না।

সংবিধানের এই চারটি অনুচ্ছেদ মনযোগ সহকারে পড়লে দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকারের গ্যারান্টি যা আছে তাও পুরোমাত্রায় জাতীয় সংসদের উপর ছেড়ে দেয়া

হয়েছে। সংবিধান স্থানীয় সরকারকে সাংবিধানিকভাবে স্থায়ী কোন গ্যারান্টি দেয়নি। প্রশাসনিক একাংশ যেহেতু সংবিধানে নির্দিষ্ট নেই তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এ ক্ষেত্রে যা খুশী করতে পারেন। বর্তমানে প্রশাসনিক একাংশ ও স্থানীয় সরকারকে সমান্তরাল করাটাই স্থানীয় সরকারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সংবিধানের এই বিশেষ অনুচ্ছেদসমূহ পুন পর্যালোচনা (Review) অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

স্তর সমস্যা

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে প্রশাসনিক পদ সোপানের অনুরূপ উপর নীচ স্তর কাঠামোতে আনা অপ্রয়োজনীয়। বর্তমানে প্রতিশ্রুত চার স্তর বিশিষ্ট কাঠামো সত্যিকার অর্থে পুরোপুরি কার্যকর করা কখনও সম্ভব হবে না। করলেও তাতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা দক্ষতা কমবে এবং আর্থিক অপচয় বাড়বে মাত্র। তাছাড়া কাঠামোগত জটিলতা প্রশাসনিকভাবেও পুরো ব্যবস্থাটিকে অকার্যকর করে দেবে। ছক-৪ থেকে বর্তমানকার স্থানীয় কাঠামোর জটিলতা অনুধাবনের একটি প্রয়াস নেয়া যেতে পারে।

তাই স্তর ও কাঠামোকে সহজ করার জন্যে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারকে সর্বাধিক দুই স্তরে সীমাবদ্ধ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। সেই দু'টি স্তর হওয়া উচিত উপজেলা ও ইউনিয়ন। গ্রাম, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের প্রয়োজন নেই। এমনকি প্রশাসনিক একাংশ হিসাবেও বিভাগের সম্পূর্ণ বিলুপ্তিই কাম্য। জেলায় কোন স্থানীয় সরকারের প্রয়োজন নেই। জেলাকে স্থানীয় সরকারের পরিবর্তে শক্তিশালী মাঠ প্রশাসনের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে গড়ে তোলা উচিত। বিষয়টি পূর্ববর্তী মাঠ প্রশাসন অংশে আলোচিত হয়েছে।

ছক-৪ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো

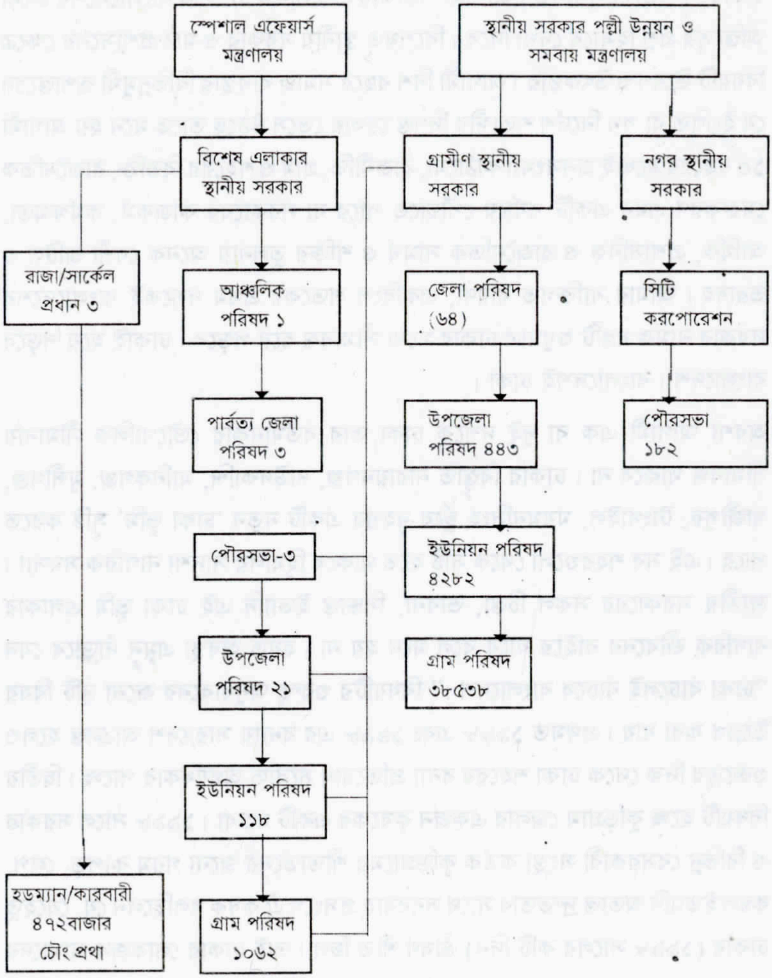

উৎস ঃ আহমেদ, তোফায়েল (১৯৯৮)।

একবিংশ শতকে বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার

একবিংশ শতাব্দী সমাগত। আগামী শতাব্দীর প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের জন্যে অস্তিত্বের প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিবে। বিশেষত স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিষয়টি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। আগামী বিশ বছরে সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্নমুখী রূপান্তরের যে ইংগিত বা পথ নির্দেশ শতাব্দীর দিগন্ত রেখায় ভেসে উঠছে তাতে মনে হয় আগামী ১০ বছরের মধ্যেই জনসংখ্যা কাঠামো, রাজনীতি, গ্রাম ও শহরের বিভক্তি, রাজনৈতিক মেরুকরণ এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যা সরকারের কাজকর্ম, কর্মক্ষমতা, আর্থিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সামর্থ ও শক্তির তুলনায় অনেক বেশী জটিল ও ভয়াবহ। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, একবিংশ শতকের প্রথম দশকেই বাংলাদেশের সরকার নামক যন্ত্রটি শুধুমাত্র ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। ঢাকাই হয়ে পড়বে বাংলাদেশ। বাংলাদেশই ঢাকা।

অবশ্য আগামী এক বা দুই দশকে ঢাকা তার বর্তমানকার ভৌগোলিক সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। ঢাকার বিস্তৃতি নারায়নগঞ্জ, দাউদকান্দি, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, টাংগাইল, ময়মনসিংহ ছুঁয়ে বৃহত্তর একটি নতুন 'ঢাকা ভূমি' সৃষ্টি করতে পারে। এই সব শহরগুলো থেকে সৃষ্টি হতে থাকবে হিমালয় সাদৃশ্য নাগরিক সমস্যা। জাতীয় সরকারের সকল চিন্তা, ভাবনা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি এই ঢাকা ভূমি এলাকার নাগরিক জীবনের বাইরে যাবে বলে মনে হয় না। হয়ত অবস্থা এমন দাঁড়াবে যেন "ঢাকা বাঁচলেই বাঁচবে বাংলাদেশ।" বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনের জন্যে দুটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। প্রথমত ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ এর বন্যায় সারাদেশ আক্রান্ত হলেও গুরুত্বের দিক থেকে ঢাকা শহরের বন্যা প্রতিরোধ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে কুড়িগ্রাম জেলার একজন কৃষকের একটি মন্তব্য। ১৯৯৮ সালে সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা কর্তক কুড়িগ্রামের শীতার্তদের জন্যে গরম কাপড়, লেপ, কম্বল ইত্যাদি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সরবরাহ প্রসংগে ঐ কৃষক বলছিলেন যে, যেহেতু ঢাকায় (১৯৯৮ সালের কটি দিন) ভীষণ শীত ছিল। তাই ঢাকার লোকজন আমাদের কথা মনে করেছে। ঢাকার আবহাওয়া উষ্ণ থাকলে কুঁড়িগ্রামে যতই শীত পড়ুক সাহায্য সামগ্রী এত তাড়াতাড়ি কুঁড়িগ্রামে পৌঁছাত না।

বর্তমানকার বিরাজিত জনসংখ্যা কাঠামোয় বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রতি ৫ জনের ৪জনই গ্রামীণ জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। আগামী শতাব্দীতে অর্থনীতির গতি প্রকৃতি ও জীবনজীবিকার বর্তমান কাঠামোতে ব্যাপক পবিরর্তন সূচিত হবে। গ্রামের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি জমির মাথাপিছু মালিকানা ১৯৮০ এর দশকেও যা ছিল ০.১০

হেক্টর, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষি ভূমির অন্যান্য ব্যবহার বিশেষতঃ শিল্প, গৃহায়ন, সড়ক, নদীভাঙ্গন প্রভৃতির কারণে তাও ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। কর্মহীন দরিদ্র মানুষগুলো অধিক হারে তাই শহরমুখী হতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া ইতিমধ্যে শহরাঞ্চলে নগর দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের ব্যাপক প্রসার ও বিস্তৃতি দেখা যাচ্ছে। অনেক বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) যারা ইতোপূর্বে গ্রামীণ দরিদ্র্য পুরুষ মহিলাকে নিয়ে নানা কাজ করতো তারা এখন অনেকেই শহরাঞ্চলে তাদের কর্মকান্ডকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পয়নিস্কাশন, ক্ষুদ্র ঋণ, শিশু উন্নয়ন ও জেন্ডার উন্নয়ন, মানবাধিকার ইত্যাদি কার্যক্রমে বস্তিবাসীরা গ্রামীণ দরিদ্র্যদের তুলনায় অনেক বেশী মনযোগ পাচ্ছেন। তাতে গ্রামের দরিদ্রগণ স্বাভাবিকভাবেই একে অপরের হাত ধরে শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ঢাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এতে বেশ সহায়কই হচ্ছে। গ্রামে এনজিওদের বিনিয়োগ ও কার্যক্রম ১৯৯০ এর পর থেকে হ্রাস পাচ্ছে বলেই আমার ব্যক্তিগত ধারণা। হ্রাস না পেলেও যে বাড়ছে না, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

তাছাড়া চাকুরী, ব্যবসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সর্বক্ষেত্রে ঢাকাই এক মাত্র ভরসা স্থল হওয়ায় অন্যান্য ছোট বড় সকল শহরের বিত্তবান এমন কি মধ্যবিত্তরাও ঢাকামুখী। এমন কি চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী প্রভৃতি শহরগুলো ঐ সব শহরে বসবাসকারী বিত্তবানদের বিভিন্ন চাহিদা মিটাতে সক্ষম নয় বা তাদের ঐ শহরগুলো আর ধরে রাখতে পারছে না। তবে এখানে চাহিদা অর্থে বিলাস সামগ্রীর অভাবকে বুঝানো হচ্ছে না। ন্যূনতম মৌলিক গুণ মানসম্পন্ন সেবাসমূহ, যেমন চিকিৎসা ও শিক্ষার অবকাঠামো ঐ সব শহরগুলোতে অনুপস্থিত। তাই বিত্তবানরা বা ক্ষমতাশালীগণ ঢাকাকে তাদের বাঁচার অবলম্বন মনে করেই এদিকে ধাবিত হচ্ছেন।[৩৪]

সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিবিদ ও জনমিতি বিশেষজ্ঞদের যে ধারণা তাতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০২০ সাল নাগাদ বর্তমান প্রবৃদ্ধির আলোকে ১৮ থেকে ২০ কোটিতে বৃদ্ধি পেতে পারে। এই ১৮/২০ কোটির মধ্যে ৮ কোটিই নগরের বাসিন্দা হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। দেশের ছোট, মাঝারী ও বড় শহরগুলোতে এরা ছড়িয়ে থাকলেও এককভাবে ঢাকা শহর ৮ কোটি নগরবাসীর মধ্যে ২ কোটির বাসস্থান-কর্মস্থান হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষতঃ ঢাকার এই ব্যাপক স্ফীতি বাংলাদেশের রাষ্ট্র, রাজনীতি, প্রশাসন, উন্নয়ন ও সেবার সকল কাঠামো অবকাঠামোর খোলনলচে পাল্টে দেবে ধারণা করা হচ্ছে। প্রথমতঃ ঢাকা শহরের ঐ দুই কোটি এবং বৃহত্তর ঢাকা

ভূমির আরও দুই কোটি মানুষের সমস্যা সরকারকে এত বেশী ব্যস্ত ও বিব্রত রাখবে যে, ঢাকার বাইরে সরকারের কর্মকান্ড ও রাজনীতি খুব একটা যেতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের তুলনায় নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়বে। ধীরে ধীরে গ্রাম এলাকা শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি সীমার বাইরেই চলে যাবে। তৃতীয়তঃ সামগ্রিকভাবে পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি খাতে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পাবে। তাতে গ্রাম এলাকায় উন্নয়ন ও বিনিয়োগ স্বাভাবিকভাবেই নিরুৎসাহিত হবে। চতুর্থতঃ পুল এবং পুশ দুই কারণে মেধা পাচারের ফলে গ্রামাঞ্চলে নেতৃত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতার সামগ্রিক দৈন্য বৃদ্ধি পেয়ে একটি অকল্পনীয় অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা রাজশাহী ছাড়াও দেশের অন্যান্য শহরগুলোতেও ব্যাপক হারে নাগরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। চাপ বাড়বে সীমাবদ্ধ সম্পদের উপর। তাই সারা দেশে নগর ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক সেবা বা পৌর সেবা বজায় রাখা দুষ্কর হবে। পৌর এলাকার বাসিন্দাগণ স্বাভাবিকভাবে গ্রামীণ জনসমাজের তুলনায় বেশী রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এভাবেই গ্রামগুলো ব্যাপকভাবে অবহেলিত বা সরকারের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতে পারে। এমনকি বর্তমান সময়েও (১৯৯৯) স্থানীয় সরকারের জন্যে বরাদ্দ সরকারী অনুদানের সোজাসুজি তিন চতুর্থাংশ নগর স্থানীয় সরকারের জন্যে ব্যয় হয়। ভবিষ্যতে আগামী দশ বছরে নগরের সেবা চাহিদা আরও অন্ততঃ দশগুণ বৃদ্ধি পাবে।[৩৫] তখনকার অবস্থায় গ্রামীণ বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসন এবং গ্রামীণ স্থানীয় সরকারকে কিভাবে কার্যকর রাখা সম্ভব তা এখনই চিন্তা করা দরকার। তাই এই লক্ষ্যে এখন থেকেই গ্রামীণ স্থানীয় সরকার বিশেষতঃ ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালীকরণ, দেশে অহেতুক রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের জন্যে বিভিন্ন থানার কেন্দ্রে বাজারকেন্দ্রিক পৌরসভা সংখ্যা বৃদ্ধি করে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি না করে জেলা সদর, শিল্প এলাকা, বন্দর এলাকা এবং বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে পৌর সরকারকে শক্তিশালী করা উচিত। থানা কেন্দ্রিক একটি নতুন পৌরসভা শুরু করতে সরকারের প্রায় ৩০ লাখ টাকা এককালীন এবং প্রতি বছর আরও গড়ে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। অথচ থানা সদরের ইউনিয়ন পরিষদের মান্নোয়নের মাধ্যমে সে বিপুল খরচ সাশ্রয় করে সকল ইউনিয়ন পরিষদগুলোকেই সহায়তা করা যায়। জেলা পর্যায়ে গড়ে তোলা উচিৎ শক্তিশালী সমন্বিত এবং প্রশাসনিক ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা কাঠামো। তাছাড়া শিল্প, ব্যবসা, সেবা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন) প্রভৃতির ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার। তাই বিকেন্দ্রীকরণ শুধু স্থানীয় সরকার সৃষ্টিতে

সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। সরকারী মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ইত্যাদির সংখ্যা কমিয়ে ঢাকা কেন্দ্রিক মাথাভারী জনবল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোকে কেটে ছেটে এক তৃতীয়াংশ করে যায়। মাঠ পর্যায়ে জনবল, ক্ষমতা, অর্থ ও দক্ষতাকে বিস্তার করে দিতে হবে। একুশ শতকের জনপ্রশাসন সংস্কার চিন্তাকে তাই ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ, ঢাকা বিমুখী এবং মাঠ প্রশাসন ও উন্নয়ন চিন্তায় সংস্থাপিত করতে হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

১. আধুনিক রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে যে শ্রেণী বা শ্রেণীসমুহ রাষ্ট্রকে অধিকার করে আছে সে অধিপতি শ্রেণী বা রাষ্ট্রীয় অভিজনদের পুঁজি আঁহরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাপক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সামসাময়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণীমূলক একটি মনোজ্ঞ আলোচনার জন্য দেখুন Tofail Ahmed, Decentralization and the Local State Under Perepheral Capitalism, Dhaka, Academic Publishers, 1993, PP-52-117.

২. T. B. Bottomore,(1975) Sociology : A Guide to Problems and Literature, Unwin University Books, London, 1975 (3rd ed), PP-151-167.

৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ ও রাজনীতি শীর্ষক একটি ধারাবাহিক রচনা (প্রতি বুধবার প্রকাশিত হয়) ১৯৯৮-১৯৯৯, দৈনিক সংবাদ।

৪. অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, বাংলাদেশের লোক প্রশাসন ঃ তত্ত্ব ও তথ্য, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, বাংলাদেশের লোক প্রশাসন (অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান সম্পাদিত) পৃষ্ঠা-১-৪৪ (১৯৮২)।

৫. History of Bengal Vol.-I University of Dhaka, 1976 এবং মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত।

৬. ষষ্ঠ শতকে বাংলাদেশ দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে কিছু স্বাধীন রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বাধীন রাজাদের পর পালরা প্রায় ৪০০ বছর শাসন পরিচালনা করে। পালদের পর আসে সেন বংশ।

৭. বাংলাদেশের দুই দশকের প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত বিভিন্ন কমিটি/কমিশনের একটি তালিকার জন্যে দেখুন Musleh Uddin Ahmed, Redesigning of Public Administration System in a Developing Country : The Case of Bangladesh Administrative Reform from 1971 to 1995, Social Science Review (SSR) Vol-XIII No.2 (1996) PP47-66.

৮. বিশ্বব্যাংক, দক্ষ সরকারে রূপরেখা ১৯৯৬, ঢাকা।

৯. প্যারিসের এইড কনসোর্টিয়াম সভায় পেশ করার জন্যে UNDP কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ Country paper দেখুন ১৯৯৭ এবং ১৯৯৮।

১০. বাংলাদেশের সরকারের গেজেট (অতিরিক্ত) নভেম্বর ৭, ১৯৯৭।

১১. Tofail Ahmed, 1993 দেখুন।

১২. Philip Mawhood, Shabbier Cheema and D. A. Rondinnely এবং Norman Uphaff এর সংশ্লিষ্ট রচনার গুলোর বিস্তারিত আলোচনার জন্যে Tofail Ahmed (1993), প্রাগুক্ত দেখুন পৃষ্ঠা ২৮-৩২।

১৩. A.M. M. Sawkat Ali. Field Administration and Rural Development in Bangladesh Dhaka, Center for Social Studies, 1982.পরবর্তীতে Rear Admiral M. A. Khan (Khan Commiittle) এর সভাপতিত্বে গঠিত The Committee of Administrative Reorganisation/ Reform, 1982 এর প্রতিবেদনে মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত দেখুন পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪।

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা-১

১৬. Nazmul Abedin, Local Administration and Politics in Modernizing Societies Bangladesh and Pakistan, NIPA, Dhaka, 1973.

১৭. Administration and Services Reorganization Committee 1973 (Chairman, Professor Muzaffar Ahmed Chowdhury).

১৮. Committee for Administrative Reorganization /Reform 1982 (Chairman) Rear Admiral M. A. Khan).

১৯. ২৪শে নভেম্বর ১৯৯১ইং সনে প্রথম ১৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। পরে এ সংখ্যাকে ১৭ এ উন্নীতে করা হয়। কমিশন ৩০-০৭-৯২ইং তারিখে ৬২ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।

২০. ১৯৯১ইং সনের ১লা সেপ্টেম্বর স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত হয়। কমিশনে চারজন সংসদ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার মধ্যে বি.এন.পির সংসদ কমিশনের কাজে অংশগ্রহণ করেননি। আট মাস কাজ করে কমিশন ১৯৯২ সনের মে মাসে ৩৪ পৃষ্ঠার ৭টি পরিশিষ্ট ও ২৪ পৃষ্ঠার সার সংক্ষেপ ছাড়া ৭৩ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন।

২১. তোফায়েল আহমেদ ও আবদুল কাদের, স্থানীয় সরকারের যুগসন্ধিক্ষরণ ঃ কাঠামো কার্যগত সংস্কারের আলোকে কিছু সুপারিশ, বার্ড, কুমিল্লা ১৯৯২। এই পুস্তিকায় গবেষণাভিত্তিক অনেক সুপারিশ সন্নিবেশিত হয়। যা পরবর্তীতে হুদা কমিশন ও রহমত আলী কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়।

২২. তোফায়েল আহমেদ ও আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, দেখুন।

২৩. তোফায়েল আহমেদ, স্থানীয় সরকারের সংস্কার ভাবনার দুই দশক, কোষ্ট ট্রাস্ট, ভোলা, ১৯৯৮।

২৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (৩০ জুন ১৯৯৪ পর্যন্ত সংশোধিত) দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ ২২ ("রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।")

২৫. বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৩, ১৯৯৮। ১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন।

২৬. ঐ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তফশীল দেখুন।

২৭. উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮, ধারা ২৫।

২৮. উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮, এর ৯, ১৩৪, (২) (৩), ১৮, ২০, (২), ২৩ (২), ২৪(৩) ২৬(২)(৪), ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৮(২), ৩৯(১) ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৬৫, ধারা উপধারা সমূহ পর্যালোচনা করে দেখুন। ভবিষ্যতে উপজেলা বিধি প্রণীত হলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

২৯. তোফায়েল আহমেদ, ১৯৯৮, প্রাগুক্ত দেখুন।

৩০. Tofail Ahmed and M. Nurul Islam, Decentralized District Planning A Framework for Action, 1995 (স্থানীয় সরকারের সংস্কার ভাবনার দুই দশক) পৃষ্ঠা ১৪১-১৬০.

৩১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৯৪) পৃঃ ৯ এবং ৪৩।

৩২. ঐ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-১৩৫।

৩৩. World Bank and Center for Advance Studies (1998) Bangladesh : 2020, UPL, Dhaka P-60.

৩৪. World Bank and Center for Advanced Studies (1998), প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৪২।

৩৫ Tofail Ahmed, Local Government for the Next Millennium : Bangladesh perspective, Awaith Publication (1999).

অর্থ-ব্যবস্থার স্বরূপ

এস, এম, আলী আব্বাস *
এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম * *

গ্রন্থাগার
লোক প্রশাসন সাময়িকী
সাভার, ঢাকা

ভূমিকা

যে কোন ধরনের অর্থ-ব্যবস্থায় তিনটি প্রধান কাজ হয়ে থাকে। কাজ তিনটি হলো উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ। সকল অর্থ ব্যবস্থারই কাজ এ তিনটি হলেও কাজ হওয়ার প্রক্রিয়া এক রকম নয়। প্রকৃতপক্ষে কাজ তিনটি এক এক অর্থ ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্নভাবে হয় বলেই বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক এবং ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থায়ও প্রধানতঃ উপরোল্লিখিত তিনটি কাজ হয়ে থাকে। কিন্তু উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের ধরন এসব অর্থ-ব্যবস্থায় ভিন্নতর প্রক্রিয়ায় হয় বলে এদের চরিত্রের মধ্যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে অর্থ ব্যবস্থা বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে কয়েকটি স্বত:সিদ্ধ সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

"An economic system may be defined as the sum total of institutions and pattern of behaviour that organize economic activities in a society".

-Encyclopadia Britanica.

"An economic system consists of those institutions which a given people or nation or a group of nations has chosen or accepted as the means through which its resources are utilized for the satisfaction of human wants".

-William N. Loucks
-William G. Whitney

---

* উপ-প্রধান, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী প্রকল্প, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

* * গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উপরোক্ত তিনটি কাজ বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে হয়ে থাকে। বাজার অর্থনীতির ভিত্তি উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি। অপর পক্ষে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ঐ কাজগুলি রাষ্ট্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সেখানে উৎপাদনের উপরকণের মালিক রাষ্ট্র। ব্যক্তি মালিকানা সেখানে অনুপস্থিত। ইসলামী অর্থনীতিতে উপরোক্ত তিনটি কাজ বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত হলেও ব্যক্তি মালিকানা সেখানে অবাধ ও অসীম নয় বরং সামাজিক ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা দ্বারা সেটি নিয়ন্ত্রিত।

উপরোক্ত তিনটি কার্য্যাবলীর সাথে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার সম্পর্ক কি? মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা অর্থ-ব্যবস্থার একটি অংশ বা অঙ্গ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে 'উৎপাদন' প্রক্রিয়াকে সহজ, স্বাভাবিক, দ্রুততর এবং প্রতিবন্ধকতাহীন রাখার জন্য সহায়ক ভূমিকায় আসে মুদ্রা ও ব্যাংক-ব্যবস্থা। উৎপাদনের চার উপকরণ (জমি, শ্রম, মুলধন ও উদ্যোক্তা) এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ মূলধন যোগানোর ক্ষেত্রে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটু ভিন্নতর হলেও বীমা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ঝুঁকিমুক্ত করে উৎপাদনের স্বাভাবিক প্রবাহ চালু রাখে।

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে অর্থ-ব্যবস্থার পরিচয় এবং তার সাথে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করা হবে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পুজিবাদী, সমাজবাদী ও ইসলামী অর্থনীতির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হবেঃ

অর্থ ব্যবস্থার পরিচয়

১.১ অর্থ-ব্যবস্থার ধারণা

অর্থ ব্যবস্থা হলো এমন একটি কাঠামো যার মাধ্যমে উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের মত তিনটি মৌল কাজ সম্পাদিত হয়। মানুষ স্বীয় প্রয়োজনে দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন করে। তার বিনিময়ে সে আয় বা রোজগার করে। এই আয়ের একটা অংশ দিয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে ভোগ করে এবং বাকী অংশ পুনরুৎপাদনে ব্যবহার করে। উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের কাজটি একটি ব্যাপক আন্তঃ সম্পর্কীয় ব্যবস্থাধীনে সম্পাদিত হয়। এই ব্যবস্থাটি কেমন এবং সেখানে ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা কিভাবে সম্পর্কিত চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

চিত্র

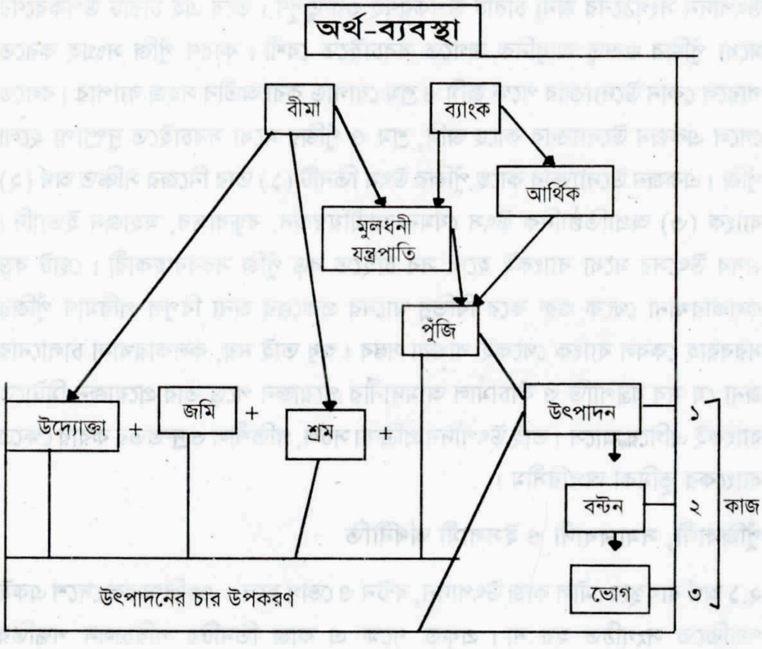

১.২ উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের মধ্যে সম্পর্ক ঃ

উপরের চিত্রে একটি অর্থ ব্যবস্থার তিনটি প্রধান কাজের (উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ) চক্রাকার আবর্ত দেখানো হয়েছে। উৎপাদনকে সরবরাহ এবং ভোগকে চাহিদা বলা যায়। চাহিদার প্রকৃতি ও পরিমাণ কি কি পণ্য ও সেবা কতটা উৎপাদন হবে সেটা নির্ধারণ করে। পণ্য ও সেবা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আয়ের সৃষ্টি হয়। এই আয়ই ভোগের চাহিদা সৃষ্টি করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট আয় কে কতটা পেলো সেটিই বন্টনের মূলকথা। উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকে উদ্যোক্তা, জমির মালিক, শ্রমিক ও পুঁজিদাতা। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট আয়ের এরা হিস্যাদার। কোন উৎপাদন একক থেকে যে আয় সৃষ্টি হয় এই চার হিস্যাদারের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত চুক্তি মোতাবেক তা বন্টন হয়। এরা তাদের আয় হিসেবে যে অর্থ পেলো তা দিয়ে তারা ভোগের নিমিত্তে বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করে। এ চাহিদাই নির্ধারণ করে পরবর্তীতে কি দ্রব্য ও সেবা কি পরিমাণে উৎপন্ন হবে।

১.৩ উৎপাদনের সাথে ব্যাংক ও বীমার সম্পর্ক ঃ

উৎপাদনের চারটি উপকরণ আছে। এগুলি হলো জমি, শ্রম, পুঁজি ও উদ্যোক্তা। উৎপাদন সংগঠনের জন্য চারটি উপকরণই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই চারটি উপকরণের মধ্যে পুঁজির গুরুত্ব আধুনিক জগতে সবচাইতে বেশী। কারণ পুঁজি সংগ্রহ করতে পারলে কোন উদ্যোক্তার পক্ষে জমি ও শ্রম যোগাড় করা অতীব সহজ ব্যাপার। বলতে গেলে একজন উদ্যোক্তার কাছে জমি, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সবচাইতে দুষ্প্রাপ্য হলো পুঁজি। একজন উদ্যোক্তার কাছে পুঁজির উৎস তিনটি (১) তার নিজের সঞ্চিত অর্থ (২) ব্যাংক (৩) অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস যেমন-আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মহাজন ইত্যাদি। এসব উৎসের মধ্যে ব্যাংকই হচ্ছে সব চাইতে বড় পুঁজি সরবরাহকারী। ছোট বড় কলকারখানা থেকে শুরু করে বিভিন্ন মানের প্রকল্পের জন্য বিপুল পরিমাণ পুঁজির সরবরাহ কেবল ব্যাংক থেকেই পাওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়, কলকারখানা চালানোর জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানীর প্রয়োজন পড়ে তার প্রয়োজন মিটাতে ব্যাংকই এগিয়ে আসে। তাই উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল, গতিশীল ও দ্রুততর করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম।

পুঁজিবাদী, সমাজবাদী ও ইসলামী অর্থনীতি

২.১ অর্থ ব্যবস্থার মৌল কাজ উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ হলেও এগুলি সকল দেশে একই পদ্ধতিতে সংগঠিত হয় না। প্রকৃত পক্ষে এ কাজ তিনটির পরিচালন পদ্ধতির বিভিন্নতাই বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থার প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য সূচনা করে। নিম্নে পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ কিভাবে সম্পাদিত হয় তার তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

২.২ উৎপাদন

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রায় সম্পূর্ণতই ব্যক্তি উদ্যোগে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ব্যক্তির। এসব উপকরণ সংগঠন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সম্পূর্ণ স্বাধীন। উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ ও কাজে লাগিয়ে যে কোন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণে এবং তাদেরকে লাভবান হতে তাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই। সে তার বুদ্ধি, যোগ্যতা দিয়ে যে কোন পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতিই পুঁজিবাদের মূলকথা সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচন এবং সেখান থেকে সম্পদ আহরণ করে যে কোন পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হতে পারে। এই মালিকানা চরম ও চূড়ান্ত। অবৈধ পন্থায়

না হলে তার এই সম্পদ ও তৎপরতায় সমাজ বা রাষ্ট্র কোন নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারেনা। "লাভ" এবং "স্বার্থপরতাই" তাই পুঁজিবাদে অর্থনৈতিক প্রগতির মূল চালিকা শক্তি। ব্যক্তির এই নিরন্তর স্বার্থপরতার অন্বেষণ বাজার শক্তির অদৃশ্য হস্তের বলে প্রতিযোগিতার নিয়ন্ত্রণাধীনে সমাজের স্বার্থ রক্ষা করে। আর এমনিভাবেই ব্যক্তির স্বার্থ এবং সমাজের মঙ্গলের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়[১]।

পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় উপকরণে ব্যক্তির মালিকানা স্বীকার করা হয় না। "ব্যক্তি মালিকানা শোষণের হাতিয়ার" হিসেবে বিচেনা করে দেশের সামগ্রিক সম্পদে রাষ্ট্রীয় মালিকানা কায়েম করা হয়। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। তার নিজের বলে দাবী করার কোন কিছুই নাই। সে সমাজ/রাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র, তার আজ্ঞাবহ। সমাজের বেঁধে দেয়া নির্ধারিত কাজ সে করবে তার সামর্থ অনুযায়ী এবং তার প্রয়োজন অনুসারে তাকে মজুরী দেয়া হবে। অবশ্য পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এ নীতি পরিবর্তন করে কাজ অনুসারে মজুরী দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত ব্যবস্থায় উৎপাদনে ব্যক্তির উদ্যম টিকে থাকা সম্ভব নয়। আর প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তি উদ্যমে ভাটা পড়াই বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার মূল কারণ[২]।

ইসলাম উৎপাদন সংগঠনে উপরোল্লিখিত দুই চরম পন্থার কোনটাই অনুসরণ করে না। ইসলাম মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী হলেও উৎপাদনের উপকরণের মালিকানায় একটি ভারসাম্যপূর্ণ দর্শন গ্রহণ করেছে। ইসলাম ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে উৎপাদনের প্রেরণা সৃষ্টির উৎস অটুট রেখেছে। অথচ এটিকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে সম্পদ কুক্ষিগত করার সুযোগ সীমিত করার আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ইসলামে উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিমালিকানার অর্থ হলো ব্যক্তি এ পৃথিবীতে বিধাতার প্রতিনিধি, সে যা কিছুই অর্জন করেছে সেগুলি ব্যবহারে খোদার নির্ধারিত সীমার মধ্যেই কেবল স্বাধীন। অর্থাৎ সে সম্পদের বা উৎপাদনের উপকরণের মালিক হলেও চূড়ান্ত মালিক নয়। কারণ সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরকালে তাকে খোদার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

---

১ অ্যাডামস্মিথ ঃ 'ইনডিজিবল হ্যান্ড' স্বল, এস, ষ্টেপেলেভিচ সম্পাদিত 'দি ক্যাপিটালিষ্ট রিভার' নিউইয়র্ক আলিটেন হাউজ পাবলিশার্স, ১৯৭৭, পৃ : ২০।

২. দি ইকনমিকস অব ফিজিবল সোসালিজম, লন্ডন ঃ জর্জ এলেন এন্ড মাউইন, ১৯৮৩, পৃ ৬৮।

২.৩ বন্টন

বাজার অর্থনীতির একটি স্বাভাবিক চরিত্রই হলো,এতে অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন লোক মেধা ও দক্ষতার বলে উত্তরোত্তর বেশী সম্পদের মালিক হবে এবং কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। এমন কি পারস্পরিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফল এই যে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অধিকাংশ সম্পদ পুঞ্জীভূত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ জীবনের মৌল প্রয়োজন পূরণেরও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানাহীনতা উদ্যমহীনতার জন্ম দিয়ে স্থবিরতা ডেকে আনে। কিন্তু পুঁজিবাদে ব্যক্তিমালিকানার উপস্থিতিতে উদ্যম চূড়ান্ত মাত্রায় থাকলেও এবং প্রবৃদ্ধির মাত্রা উচ্চ পর্যায়ের হলেও আয়ের অস্বাভাবিক বৈষম্য অর্থনীতিকে মন্দার দিকে নিয়ে যায়। কারণ আগেই বলা হয়েছে, ভোগের চাহিদাই উৎপাদনের ধরন ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। যখন অধিকাংশ লোক মৌল প্রয়োজন মিটানোর মত ন্যূনতম আয় লাভে ব্যর্থ হয় তখন ভোগের চাহিদা কমে যায়। ফলে অর্থনীতিতে নতুন বিনিয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে এবং আস্তে আস্তে অর্থনীতি গভীর মন্দার শিকার হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণে রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত। প্রতিটি জনগণ তাদের সামর্থ অনুযায়ী কাজ করে এবং কাজ অনুসারে মজুরী পায়। ফলে সেখানে শোষণের সুযোগ নাই বললেই চলে। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানার অনুপস্থিতিতে সেখানে কর্মে উদ্যমহীনতা আস্তে আস্তে চরম আকার ধারণ করে। প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতাও কাজের গতি স্তিমিত করে ফেলে। পরিশেষে সেখানে প্রশাসনিক দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করে। ফলে সাম্যের মহান বুলি ঃ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমহ্রাসমান গতিশীলতার পাঁকে পড়ে হারিয়ে যেতে বাধ্য-যার জাজ্বল্য প্রমাণ সোভিয়েট রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঘটনাবলী।

ইসলাম বাজার অর্থনীতিকে স্বীকার করে, উন্নয়নের গতিশীলতার চালক ব্যক্তি উদ্যোগকে সে কাজে লাগায়। ফলে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির সুযোগ আছে। কিন্তু এই বৈষম্য প্রকট হয়ে "কেউ খাবে না, কেউ খাবে" এরূপ চরম সামাজিক শ্রেণীগত মেরুকরণে রূপান্তরিত হতে পারে না। কারণ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় স্বাভাবিক অর্থনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে ধনীদের মধ্যে সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণের যে প্রবণতা কার্যকরী থাকে তাকে গরীবদের মধ্যে সঞ্চালনের জন্য কিছু বাধ্যতামূলক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা রাখা আছে। যাকাতসহ বিভিন্ন আর্থিক ও রাজস্ব কার্যক্রম এ লক্ষ্যে নিবেদিত। এ ক্ষেত্রে কুরআনের এ আয়াতটি স্মরণ যোগ্য যে, "ধন সম্পদ যেন কেবল মাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।"

২.৪ ভোগ

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভোক্তার ভোগের ক্ষেত্রে চরম সার্বভৌমত্ব রয়েছে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার পছন্দ ও ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে পারে, এক্ষেত্রে ব্যক্তির ভোগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র তেমন কোন বিধি নিষেধ আরোপ করে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচলিত নিয়ম-নীতির মধ্য থেকে ব্যক্তি তার পছন্দানুযায়ী ভোগ করতে পারে। তবে, বাস্তবে দেখা যায় এ ব্যবস্থায় সমাজের সাধারণ ভোক্তাবৃন্দ (উমববমভ উমভ্রলবণত্র) ভোগের ক্ষেত্রে নামমাত্র স্বাধীনতা ভোগ করে, প্রকৃতপক্ষে এ স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; যাদের হাতে সম্পদের সিংহভাগের মালিকানা রয়েছে। অন্যদিকে, সাধারণ ভোক্তাগণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করার ইচ্ছা পোষণ করলেও ক্রয় ক্ষমতার অভাবে তাদের এ ইচ্ছা খুব কমই বাস্তবতার মুখে দেখে থাকে। কেননা, ভোক্তার স্বাধীনতা তার ক্রয়ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সমাজ বা রাষ্ট্র সমস্ত সম্পত্তির মালিক হওয়ায় "ভোক্তার সার্বভৌমত্ব" বলতে তেমন কিছু নেই, এক্ষেত্রে সমাজ/রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের যোগ্যতা ও দক্ষতা বিবেচনায় রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ করে থাকে। ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও পছন্দানুসারে ভোগ করতে পারে না। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তির ভোগের সার্বভৌমত্ব অনুপস্থিত। ব্যক্তি তার উচ্চতর ভোগমাত্রা নিশ্চিত করণে কখনও স্বাধীন নয়; রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের মত "ভোক্তার সার্বভৌমত্ব" বলতে যা বোঝায় তা নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে ভোগ্য সামগ্রীর তালিকা শরীয়তের সীমারেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এমনকি শরীয়ত অনুমোদিত ভোগ্য সামগ্রীও একজন মুসলিম নাগরিক সামাজিক দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নিজে ভোগ করতে পারে না। হাদীসে আছে "যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেটপুরে খেয়ে ঘুমালো সে মুমিন নহে"।

২.৫ প্রচলিত ও ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যাংকিং ও বীমা

আর্থ-ব্যবস্থা পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক বা ইসলামী যেটাই হোক, ব্যাংক ব্যবস্থা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সুদ ভিত্তিক ব্যাংক-ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখলেও ধর্মীয় বিচারে গ্রহণযোগ্য নয় এবং অর্থনৈতিক বিচারে ক্ষতিকারক। ইসলাম সকল প্রকার সুদী কারবারকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সুদের অস্তিত্বের কারণে একটি অর্থ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ সুযোগের একটা বিরাট অংশ অব্যবহৃত থেকে যায়[৩]। অর্থনীতিতে মন্দার চক্রাবর্তের অন্যতম প্রধান কারণও এই সুদ[৪]। অপরপক্ষে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সুদমুক্ত হওয়ায় উপরোক্ত কুফলসমূহ থেকে ক্রটি মুক্ত।

প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত বিধায় এটিও ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। তদুপরি, প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ও বীমা উভয় ব্যবস্থার কাঠামোগত ব্যবস্থাই এমন যে, এর মাধ্যমে সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনীলোকদের হাতে দ্রুত পুঞ্জীভূত হয়। এটি প্রকারান্তরে অর্থনীতিতে একদিকে মন্দা এবং অপরদিকে সামাজিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

উপসংহার

অর্থ-ব্যবস্থাভেদে উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ সংক্রান্ত সমস্যা ভিন্নরূপ হতে পারে। এ সব সমস্যা সমাধান কল্পে বিভিন্ন অর্থ-ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক নীতিমালার উদ্দেশ্য যেমন আলাদা হতে পারে, তেমনি ঐসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মকৌশলও আলাদ হওয়া স্বাভাবিক। তবে অধিক উৎপাদন, সুষ্ঠ বন্টন ও জনগণের জন্য উচ্চতর ভোগমাত্রা নিশ্চিতকরণ এই তিনটি সাধারণ লক্ষ্য প্রায় সকল অর্থ ব্যবস্থারই রয়েছে। তবে লক্ষ্যের মধ্যে এরূপ সাযুজ্য থাকলেও লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মপন্থা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-ব্যবস্থায় আলাদা রকমের।

একটি অর্থনীতিতে উত্তরোত্তর উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। চাহিদার পাশাপাশি উৎপাদন না বাড়লে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যথাসময়ে যথোপযুক্ত নীতি অনুসরণ না করলে এটি চলতি অর্থকাঠামো বিপর্যস্ত করে ফেলে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি জরুরী, বিনিয়োগ বাড়াতে হলে কর বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়ে। আবার কর বাড়লে সঞ্চয় কমে গিয়ে বেসরকারী বিনিয়োগ কমে যেতে পারে। সুতরাং এমন একটি রাজস্বনীতির অনুসরণ করা দরকার যাতে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

---

৩ আক্কাস, এস, এম, আলী ঃ "রিলেটিভ এফিসিয়েন্সি অব কনভেনশনাল এন্ড ইসলামিক ব্যাংকিং সিষ্টেম ইন ফিন্যান্সিং ইনভেষ্টমেন্ট" পিএইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৯ (অপ্রকাশিত)।

৪ মিনিস্কাইল, ১৯৬১।

অপরপক্ষে, বন্টন সুষ্ঠু না হলে সামাজিক অসন্তোষ দেখা দিয়ে চলতি অর্থকাঠামোর স্বাভাবিক পরিচালন হুমকির সম্মুখীন করে তুলতে পারে। এ জন্যও যথোপযুক্ত নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য যদি এমন হয় যে, অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর হাতে ক্রয়ক্ষমতা না থাকে তাহলে উৎপাদন কমে গিয়ে অর্থনীতি চরম মন্দার শিকার হয়ে পড়তে পারে। তাই অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট মাত্রায় উৎপাদন, বন্টন পরিস্থিতি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য রাজস্ব ও মুদ্রানীতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

অর্থ-ব্যবস্থা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদন বন্টন ও ভোগের মত ৩টি প্রধান কাজ সম্পন্ন হয়। ক্রমাগত বর্ধিত হারে উৎপাদন, সুষ্ঠু বন্টন ও উচ্চ মাত্রার ভোগ নিশ্চিত করা প্রায় সকল অর্থ-ব্যবস্থারই প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির আশ্রয় নিতে হয়। বর্তমান বিশ্বে বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা, এর সমাধানেও মুদ্রা এবং রাজস্বনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

১. মরিস বর্নষ্টেইন ঃ কম্পারেটিভ ইকোনোমিকস সিষ্টেমস, পঞ্চম সংস্করণ, আরউইন ১৯৮৫।

২. জে, উইল জেনস্কিঃ দি ইকোনোমিকস অব সোস্যালিজম, চতুর্থ সংস্করণ,জর্জ এলেন এন্ড আনউইন, ১৯৮৬।

৩. ডঃ এম মনজের কাহফ ঃ ইসলামিক ইকোনোমি, মুসলিম ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েসন অব ইউ কে এন্ড ক্যানাডা, ইন্ডিয়ানা ,১৯৮২।

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol.13, June 1999, Ashar 1406

Foreign Direct Investment in Bangladesh : An Analysis

Khondoker Abdul Mottaleb*

Introduction

Most countries of the world are economically associated with each other in three different ways. These are through international trade; or through Overseas Development Assistance (ODA); or by the way of international capital flow.

International trade does pay a vital role in the growth and development of a country. The basis of international trade is comparative advantage, which implies that flow of goods will takes place from efficient low cost producers to inefficient high cost producers. But the poor basis of the industrial sector in the domestic economy and weak comparative advantage emanating from the inefficient operation of the industries had been constraining, many developing countries in realizing the benefit of trade.

After the cold war era, the availability of foreign aid is showing a steadily decreasing trend. For example, in Bangladesh the actual amount of inflow of foreign aid (grants+loans) in the FY 1990/91 was US$1732 million[1] and in the FY1997/98, the aid made of fresh aid pledges US$ 190 million.[2]

---

* Research Officer, BPATC.

1 Government of Bangladesh, *Bangladesh ArthanaitikSmiksha, 1998* (Dhaka:Ministry of Finance, Finance Division, June, 1997), P.133.

2 *The Bangladesh Observer* (November 14, 1997).

Now a day's Foreign Direct Investment (FDI) is the most important issue in most of the country's foreign economic policy. FDI is now acting as super alternative of ODA. In the "Dictionary of Modern Economics" FDI is defined as "any investment in another country which is carried out by private companies or individuals as opposed government aid."[3] Foreign private Investment (Promotion and Protection)Act-1980, defines foreign private investment as "Investment of foreign capital by person who is not a citizen of Bangladesh or by a company incorporated outside Bangladesh, but does not include investment by a foreign government or an agency of foreign government.[4]"

The positive role of FDI in accelerating pace of development in developing countries as is evidenced in Hong Kong, Singapore, Korea and Taiwan (these countries are known as Newly Industrialized Economies), attracting FDI has become a priority agenda for the developing countries foreign economic policy. At present"there is hardly any country in around the globe big or small, financial base or newly emerging which is not in the race of capturing foreign investment."[5]

Importance of FDI in Bangladesh

Generally, investment in an economy raises out put and improves standard of living of the people. But there are arguments for and against foreign investment in under-

3 David W. Pearce. *Macmillan Dictionary of Modern Economics* (London : The Macmillan Press Ltd. 1986)P-159.

4. GOB, *Guide to Investment Bangladesh*, (Dhaka : Board of Investment. Prime Ministers Office. March. 1998) P. 104.

5 A. H. M. Nurul Islam and Sujit R. Shaha, "Foreign Direct Investment in Bangladesh : Expectations and Realities" *Bank Parikrama*. Vol. 18, No's 3 & 4 (September & December. 1993). PP. 71-72.

developed countries. Those against, say that it constitutes economic colonialism and is an attempt to retain control of ex-colonies. The arguments supporting foreign investment are that, this type of investment achieved beneficial results in the East Asian countries, and therefore will succeed elsewhere. There can be no general solution to this debate since each individual case has to be judged on its own merits. In Bangladesh, a healthy flow of FDI is increasingly getting priority in the government economic agenda. A news items published in "The Financial Express"said that, "along with the government, private sector investment need to be increased immediately to bridge the yawning gap in infrastructure sector."[6] The same report said that, Bangladesh requires a minimum of 1.75 billion dollars each year for infrastructure development. In a report the World Bank states that, most developing countries need massive investment in sanitation and in water supply infrastructure. In developing countries, one of the most pressing problems is the overwhelming need to invest heavily in sanitation facilities and the provision of clear water. The World Bank has estimated, over the next decade, between $600,000 millions and $800,000 million will be required to meet the total demand for fresh water, including for sanitation, irrigation and power generation.[7] Since the supply of capital from the local source in Bangladesh is not adequate to meet the growing need for investment due to low rate of domestic savings, the importance of FDI is increasing day by day.

In the previous period, the country's savings investment gap were bridged by foreign aid or loans. But given the current aid scenario, Bangladesh have to look for other sources of foreign

6 *The Financial Express*, (February 1, 1999).

7 United states Information Services, *News Feature*

exchange to support its current account balance as well as rising investment level. The most promising source of foreign exchange for the developing countries in recent years has been foreign direct investment (FDI). Therefore, there is now widespread support for the need of FDI in Bangladesh.

FDI and the policy of Bangladesh government

Over the recent past, most nations in the world including the former socialist bloc, are adopting increasingly more open policy towards FDI. For example, "during 1991, 35 countries made 82 changes in foreign direct investment policy. Nearly 80 of these changes were in the direction of greater liberalization of FDI".[8] Bangladesh is not behind in terms of policy formulation towards FDI. In the initial years of after liberation, the aim of the country was to build up an exploitation free society, for this reason, private and foreign investment were both discouraged at that time. But in the face of increasing globalization, the country has realized the importance of strong private sector. In order to strengthen private sector, the government of Bangladesh adopted the policy of privatization and this procedure is still continuing. Moreover to attract both foreign and domestic investment the government announced "New Industrial Policy" (NIP) in June-1982[9] and as well as "Private Foregin Investment Act-1980"[10]. The main provisions of "Private Foreign Investment Act-1982 are as follows:

---

8 Roy. J Ruffian, "The Role of Foreign Direct Investment in Economic Growth of the Asia and Pacific Region" *Asian Development Review* Vol. II No. I (1993) P. 13

9 For Details See Government of Bangladesh. *Industrial Policy-1982*(Dhaka : Ministry of Industries, 1982).

10 For Details See *Report of the Tasks Forces on Bangladesh Development Strategies for the 1990s, Managing the Developing Process*, Vol. 2, S. A. L. Reza (Conveynor), (Dhaka : University Press Limited, 1991), pp. 75-77.

- Ensuring qual treatment for foreign and local investment in all respects;
- Protection of foreign investment from nationalization, reinsuring repatriation of proceeds from sale of shares and profits;
- Protection of intellectual property rights.

The government of Bangladesh has also formulated new industrial policy In 1986 and in 1991 (revised in 1992), to accelerate the private investment. In the industrial policy 1991 (revised in1992), all sectors of the economy are allowed to private investor except the following five[11]

- Arms ammunition and other defense equipment and machinery;
- Production of atomic energy;
- Forest plantation and mechanized extraction within the bounds of reserved forest;
- Security printing (currency notes) and minting; and
- Railways and air transportation.(except air cargo and domestic air transportation).

All Sectors excepting the aforementioned reserved industries, are open for private sector investment. Investment in the form of joint venture and 100% foreign ownership by foreigners in the following five listed areas are specially encouraged by the government:

- Export oriented industries;
- Industries located in the Export Processing Zones;

11 GOB. *Guide to Investment in Bangladesh. Op. Cit.* PP.10-11.

- The industries that are based on the high technology, that are either efficiently import substituted or export oriented;
- The industries beside on intensive use of the local resources;
- Such types of industry, where there is scope for improving quality, production and marketing.

In the present policy packages of the government, there are a good number of incentives offered towards the foreign investors, which are as follows:

- Depending on the nature and location of industry, 2.5% to 15% concession of the payable rate of duty on the imported machinery;
- Tax holiday for 5 to 12 years;
- Instead of tax holiday, allowances of accelerated depreciation;
- For the tax assessment, liberal investment allowances;
- Tax exemption on, royalties interest on foreign loans, capital gains from the transfer of shares and technical assistance fees;
- Repatriation of invested capital, and dividends;
- No restrictions for the foreign nationals in issuing work permit in Bangladesh;
- On the basis of bilateral agreement avoidance of double taxation;
- Income tax exemption up to three years for the foreign technicians employed under the approved industries;

- Investment in share's and securities through Dhaka Stock Exchange without prior approval of Bangladesh Bank;
- Treatment of reinvested reportable dividends as new investment.

Nevertheless duty free import of capital machinery for the export oriented industries are also included in the incentive packages offered by Board of Investment.[12]

The government enacted "The Bangladesh Private Export processing Zones Act 1996, allowing setting up of export processing zones in the private sector with a view to attracting more investment especially foreign investment in the country. Recently the government has been taken the following measures for maximizing foreign investment. These are:

- Law Reform Commission Act;
- Investment Visa for the Investors;
- Permission to set up clinic by foreign doctors by joint venture.

Actually the scope and incentives currently provided by Bangladesh in comparison with SAARC countries and other East Asian countries are broadly similar, or some where more liberal than the policy of the other countries in this region. A news item published in 1999 that, now the policy of Bangladesh in terms of FDI is the most liberal policy in the whole Asia[13].

---

12 For Details See *Report of the Tasks Forces on Bangladesh Development Strategies for the 1990s, managing the Developing Process*, Op. Cit. PP.58-59.

13 The Daily Ittefaq (April 12, 1999).

The trends of FDI inflow in Bangladesh

Recently in Bangladesh FDI inflow in each year is showing a positive rising trend. In 1980s the average annual inflow of FDI (excluding reinvested earnings) were around US$ 2 million per annum for Bangladesh.[14] In the 1990s it increases to US$ 26.33 per annum.[15]

Table - 1: The year wise Position Joint venture/100% Foreign Investment Projects registered with the BOI from 1991 to June 1998.

Year	No. Of Units	Proposed Investment (In million Taka)
1991-92	24	1017.500
1992-93	28	2108.667
1993-94	100	32164.645
1994-95	145	29195.939
1995-96	127	62607.847
1996-97	138	45153.865
1997to June 1998	140	153079.238
Total	702	325327.69

Source : Compiled from, GOB, Board of Investment (BOI), 1998 (Unpublished)

From Table-1, in 1991-92 the total sanctioned units were 24, with an amount of registered investment with BOI were 1017.500 million taka. But in the fiscal year 1997-98 total number of sanctioned units are 140 and the amount of proposed registered investment with BOI are 153079.238 million taka. From Table-1, since 1991-92 to 1997-98, the total FDI registered with BOI is 325327.69 million taka. The

14 Sanjaya Lall, "Foreign Direct Investment in South Asia", *Asian Development Review* Vol. II, No. 1(1993).

15 Compiled from Asian Development Bank, *Asian Development outlook 1997 and 1998.* P.239.

amount is not negligible at all. Therefore one can say that Bangladesh is going to treat as a profitable destination for investment to the foreign investors.

Sector wise Distribution of FDI :

The table-2 of the next page is showing a detail picture about the inflow of FDI in each sector from 1991-92 to 1997-98. From table 2: it is clear that in 1991-92 Food and Allied industries and Textile Industries were the two largest FDI exploitor sector respectively. The inflow of FDI in these two sector was 443 and 293 million taka respectively, which were 43.6% and 28.83% of total FDI. In 1992-93 Food and Allied industries were the largest FDI consuming sector. In that period total FDI inflowed to that sector was 1120 million taka which was 52.13% of the total FDI. In 1993-94 Textile Industries and the Chemical Industries were the two largest FDI recipient sector. The percentage of FDI flowed in these two sector were 44.80% and 46.27% out of total FDI respectively. In 1994-95 Textile Industries and Engineering Industries were the two larger recipient sector. These two sector had received 23.17% and 24.38% of total FDI respectively. In the fiscal year 1995-96, the Chemical Industries were the largest FDI recipient sector. It received 37.02% of total FDI in that fiscal year. But in the fiscal year 1996-97, service sector was the individual largest sector in terms of receiving FDI. it received 50.34% of total FDI in that period and still this sector is the dominant sector in receiving FDI. In the fiscal year 1997-98 the service sector was the largest recipient sector in terms of receiving FDI, it exploited 72.22% of total FDI flowed in the country the amount of which was 110546.511 million taka. Data provided by BOI showed that, the largest recipient sector in terms of FDI is the Service sector, Textile industries and Chemical Industries.

Table-2 : The group wise particulars of FDI projects registered with the BOI form 1991 to 1998 (June) (in million taka). The value in the Parenthesis shows the Percentage

Name of the Group	No. of Units	Sector wise flow of FDI and the percentage of total FDI from 1991-92 to 1997-98 (in million taka)							Total Proposed Investment	% of total FDI
		1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98		
Agro-Based Industries	44	26 (2.56)	0	670 (2.08)	1638 (5.61)	1910 (3.05)	662 (1.46)	385.456 (0.25)	5291.456	1.64
Food & Allied Industries	76	443 (43.6)	1120 (53.13)	137 (0.43)	534 (1.83)	1357 (2.17)	2312 (5.12)	16804.054 (10.98)	22707.054	6.98
Textile Industries	181	293 (28.83)	223 (10.58)	14411 (44.80)	6766 (23.17)	3979 (6.35)	6798 (15.05)	4498.816 (2.94)	36968.816	11.36
Printing and Publishing	16	2 (0.19)	118 (5.60)	44 (0.13)	214 (0.73)	41 (0.06)	117 (0.26)	0	536	0.17
Tannery and Lather Industries	33	125 (12.3)	0	194 (0.60)	901 (3.80)	669 (1.06)	169 (0.37)	1023.088 (0.67)	3081.088	0.95
Chemical Industries	81	5 (0.49)	37 (1.75)	14882 (46.27)	5069 (17.36)	23182 (37.02)	3451 (7.64)	2611.916 (1.71)	49237.916	15.13

Source : GOB, Board of Investment 1998 (unpublished)

Table-2 (2) : The group wise particulars of FDI projects registered with the BOI form 1991 to 1998 (June) (in million taka). The value in the Parenthesis shows the Percentage

Name of the Group	No. of Units	Sector wise flow of FDI and the percentage of total FDI from 1991-92 to 1997-98 (in million taka)							Total Proposed Investment	% of titak FDI
		1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98		
Glass Ceramics and Other non metalic Mineral Products	26	0	0	316 (0.98)	4805 (16.45)	1942 (3.10)	4731 (10.48)	4820.369 (3.14)	16614.369	5.11
Engineering Industries	117	47 (4.63)	290 (13.76)	964 (2.99)	7120 (24.38)	6695 (10.69)	3830 (8.48)	515.048 (0.34)	19461.048	5.98
Service Industries	88	0	301 (14.28)	363 (1.12)	1986 (6.80)	2586 (4.13)	22730 (50.34)	110546.511 (72.22)	138512.51	42.57
Misc./NEC	40	75 (7.38)	19 (0.90)	184 (0.57)	163 (0.55)	20247 (32.33)	354 (0.78)	11873.980 (7.76)	32915.98	10.11
Total	702	1016	2108	32165	29196	62608	45154	153079.238	325326.24	100

Source : Compiled from GOB Board of Investment, (BOI) 1998 (Unpublished).

The Major Investor Countries and their Proposed Investment

Table-3 shows the major investor countries and their proposed investment registered with the BOI form 1991/92 to 1997/98. From Table-3, USA is now the largest investor country in Bangladesh. The proposed investment of USA registered with BOI up to 1998 (June) is 70829.504 million taka which is 21.77% of total FDI in Bangladesh. The second largest investor country in Bangladesh is Malaysia. It invested 54362.59 million taka which is 16.71% of total FDI in Bangladesh. The other major investor countries are Lebanon (11.99% of total FDI) Japan (10.65% of total FDI), Hongkong (10.33% of total FDI), Kingdom of Saudia Arabia (KSA) (3.53% of total FDI), South Korea (3.62% of total FDI), UK (4.01 % of total FDI) and Singapore (3.19% of total FDI). One of the interesting fact here is that, before 1997/98 the amount of investment by USA was very negligible. It was only 3970.242 million taka. But in the Fiscal year 1997/98 USA proposed to invest 66859.262 million taka which is 43.68% of total FDI in that fiscal year. Another important fact as is depicted in the table-3 is that, though Lebanon is a new comer as an investor in Bangladesh but it proposed to invest 39010 million taka which was 25.48% of total FDI in the fiscal year 1997/98 and 11.99% of total FDI in Bangladesh.

Table-3 (1) : The Major Investor Countries and Proposed Investment Registered with BOI from 1991/92 to 1997/98 (In million Taka)

Country	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	Sub-total	1997/98	Total
USA	———	59.260	95.006	508.93	2982.796	324.250	3970.242	66859.262	70829.504
		(2.82)	(0.295)	(1.74)	(4.76)	(0.72)		(43.68)	(21.77)
Malaysia			10802.191	5583.3	22137.634	1870.465	40393.59	13969	54362.59
			(33.58)	(19.12)	(35.36)	(4.14)		(9.13)	(16.71)
Lebanon								3910.00	39010.00
								(11.99)	(11.99)
Japan	37.692	83.708	1985.03	3362.75	25897.79	456.538	31823.508	2840.206	34663.714
	(3.71)	(3.96)	(6.17)	(11.52)	(41.37)	(1.01)		(1.86)	(10.65)
Hongkong	96.121	18.962	36.944	4413.987	625.335	20823.386	26014.735	7592.287	33607.022
	(9.44)	(0.9)	(0.12)	(15.12)	(1.0)	(46.12)		(4.96)	(10.33)

Source : Compiled from GOB Board of Investment, (BOI) 1998 (Unpublished).

Table-3: (2)

Country	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	Sub-total	1997/98	Total
KSA	—	—	11388.4	72.0	—	—	11460.4	26.0	11486.4
			(25.41)	(0.24)				(0.01)	(3.53)
UK	115.109	72.366	2892.732	2057.834	2968.087	3398.07	11504.187	1557.59	13061.777
	(11.32)	(3.43)	(9.0)	(7.05)	(4.74)	(7.53)		(1.02)	(4.01)
S. Korea	14.993	257.833	789.034	1432.764	1257.233	3695.217	7447.074	4354.257	11801.331
	(1.48)	(12.23)	(2.45)	(4.91)	(2.01)	(8.18)		(2.84)	(3.62)
Singapore	90.040	814.67	38.0	2137.18	27.300	5677.911	8785.101	1603.27	10388.371
	(8.84)	(38.64)	(0.11)	(7.32)	(0.04)	(12.57)		(1.05)	(3.19)
Others	663.545	801.868	4137.308	9627.194	6711.683	8908.028	30929.174	15267.358	46196.532
	(65.21)	(38.02)	(12.86)	(32.98)	(10.72)	(19.73)		(9.97)	(14.2)
Total	1017.5	2108.667	32164.645	29195.939	62607.847	45153.865		153079.238	325327.69
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)		(100)	(100)

Source : Compiled from, Board of Investment (BOI), 1998 (Unpublished).

Problems in relation to FDI in Bangladesh

Though a positive rising trend is showing in terms of FDI (form table-I), Bangladesh lags far behind as compared to most other Asian countries in attracting FDI. The data published by Asian Development Bank Show that, Sri Lanka received 7% of total FDI (The amount of which is US$ 195 million) in the SAARC region. Inspite of LTTE insurgency in the North West, Sri Lanka is still an attractive country form foreign investment. While in Bangladesh,the amount of FDI inflowed in 1995 was only 5% (US$125 million) of total FDI in the SAARC region. It is depicted that, India is the largest recipient of FDI among the SAARC countries. In 1995 India received 65% of total FDI inflowed in this region the amount of which was 1750 million US$. Pakistan is the second largest FDI recipient country. In 1995 actual inflow of FDI in Pakistan was 23% of total FDI in the SAARC region (the amount of which is 639 million US$).[15]

Actually in terms of registration with BOI, it shows that the inflow of FDI is increasing day by day. But this satisfaction is based only on the information in terms of project investments in the registration/approved only. BOI under took a survey during July-Nov. 1994. with a view to estimate the realization rate, under the proposed enterprises, who registered between 1992 and 1994. The survey reports that, between 62 to 65 percent of foreign private enterprises are being implemented, out of which 35 to 40 percent have gone into production.[16] A recent survey of the Board of investment says, during July 1996 to June-1998, the BOI registered a

15 Asian Development Bank, *Asian Development Outkook 1997 and 1998* (Manila : ADB, 1998) P. 239

16 GOB. *Fifth Five year plan* (Draft) 12997-2002pvi-10)

total 278 foreign projects worth 4.4 billion dollar. The BOI survey mentioned that, 120 foreign projects involving an amount of 2.9 billion dollar have not yet made any physical progress[17]. Sadrel Reza, in his book mentioned that, before liberation (up to 1971), total sanctioned units with FDI were 23, all of those had gone into production. From 1982/83 to 1990/91 total sanctioned units were 101. Out of those, only 40 units had gone into production. In the fiscal year, 1991/92 total registered units were-24, out of those 18 units had gone into production[18]

Another problem with FDI is that, all foreign investments does not represent net transfer of resources from abroad to Bangladesh, maximum investments are just reinvested earnings. Compared to freshly imported capital, reinvested earnings originate as savings from investments previously made.In Bangladesh the share of reinvested earnings in FDI "had risen above 90 percent in 1988 and 1990,it never went below one third of the total during the entire period under consideration."[19]

Therefore it is now a common feature with Bangladesh that, many of the approved investment proposals involving FDI are not actually implemented. There will be some natural'doropout's which can be considered as normal for a certain number of proposals. But the fact is that, there has only been about 62-65% realization rate and new investment sanctioned is not descent at all. This rate is much below the experience of other Asian Countries. For instance, about

---

17 *The Bangladesh Observer* (October28, 1988)

18 Sadrel Reza, *Tranrational Corporations in Bangladesh. Still at bay?* (Dhaka : University Press Limited, 1995). PP.21-22.

19 Ibid, p.27.

80% of the projects approved in the period from 1971 to 1983 in Malaysia, started production or were in the advanced stages of implementation. So in Bangladesh the experience is not sweet. Therefore one could observe a significant discrepancy on the annual amount of FDI among the BOI data table-1 and the data recently published in the Asian Development Outlook 1997 and 1998.

Another problem relating to FDI is that, FDI is not coming enormously to the thrust sector of the economy. For example, Agro-Processing and Computer software sector are the two thrust sector of the country. In view of large international trade volume in the area of softwaer development, data entry and data processing, foreign private investment encouraged and accorded priority. This industry has an enormous potential for generating foreign exchange and employment. But the fact is that, this sector has received only US$ 4 million of FDI[20]. But to facilitate rapid expansion of this sector, FDI have to encourage this sector. The main thrust of private investment in agriculture is attainment of food self sufficiency. crop diversification and acceleration of investment in the livestock, fisheries and forestry sub-sectors. One of the major efforts in this area is the construction of the "Ganges Barrage". So a healthy inflow of FDI is expected in this sector. But this sector received only 7 million dollars of FDI. So the thrust sectors fails to draw FDIs properly.

There are various things working as barrier in the way of FDI. The major impediments in the way of the sufficient inflow of FDI is, the negative image of the country. Moreover political instability, particularly repeated heartless, redtapism, bureaucratic hurdles and lengthy administrative procedure,

---

20 *The Bangladesh Observer* (October 28, 1998).

inadequate infrastructure, particularly energy and telecommunication facilities, rigid and conservative banking system and absence of service-oriented banks, lack of accurate information for taking correct business decision etc. are now workings barrier in the way of sufficient inflow of FDI. Even due to non-fulfillment of commitment by financial institution many foreign investors have to suspend implementation of their projects[21]. The bureaucratic road block, poor reaction by authorities towards quick solution of problems and absence of economic solution hamper the enormous inflow of FDI in the country. A survey reported that, "problems in getting land and service facilities for a project, bureaucracy and port hazards have stalled progress of the proposed foreign investment nearly 3 billion dollar during the last two fiscal year (i. e. 1996/97 and 1997/98).[22]

Conclusion

In order to face the challenges of the 21st century, the government have to take necessary measures to remove those constraints, e. g., shortage of power, inadequate infrastructures, low level of human resources etc. and have to promote the image of the of the country as a safe and profitable destination of FDI. So far the latest Industrial policy of Bangladesh is considered to be one of the most liberalized policy in South Asia. Despite that, we are not yet able to draw the much-needed foreign direct investment in large volume. In this connection, it is mentionable that, the investment climate of both India and Pakistan are not that congenial than that of our country. Recently the two coun-

---

21 Dewan Zakir Hossain, "Investment Climate and trend of Foreign Investment in Bangladesh : A Study of Japanese investors" (Seminar Paper BPATC, 1997).

22 *The Bangladesh observer* (October 28, 1998)

tries have got them engaged in nuclear arms race. As a result, the investment climate of these two countries are largely affected. Foreign investors may look for alternative countries for investment. At this critical juncture, we must avail our self of this opportunity by drawing US and Japanese investment as much as we can. In this regard, parliamentary democracy and political stability of the country are the important elements, which need to be rallized and provided by both party in power and parties in opposition.

Bibliography

Islam, A.H.M. Nurul and Sujit R. Shaha, "Foreign Direct Investment in Bangladesh: Expectations and Realities" *Bank Parikrama,* Vol. 18, No's 3 & 4 (September & December, 1993).

Ahmad,Quazy Mesbah Uddian. "Foreign Direct Investment : Selected Issues and Problems withs Reference to Bangladesh." *Bank Parikrama,* Vol. 18, No's 3 & 4 (September & December, 1993).

Ahmed, Abu. "Foreign Private Investment in Bangladesh: Trens and factors affecting it "*Bank Parikrama,* Vol 18, No"s 3 &4 (September & December, 1993)

Ahmed, S. "Foreign Capital Inflow and Economic Growth : A Two Gap Model For the Bangladesh Economy." *The Bangladesh Development Studies,* Vol.3 No.2 (April, 1975).

Asian Development Bank, *Asian Development Outlook 1997 and 1998.* Manila : ADB, 1998.

Government of Bangladesh. *Bangladesh Arthanaitiks Smiksha, 1997.* Dhaka : Ministry of Finance, Finance Division, June, 1997.

——— . *Bangladesh Arthanaitik Smiksha,* 1998. Dhaka : Ministry of Finance, Finance Division, June, 1997.

——— . *Industrial Policy-1982.* Dhaka : Ministry of Industries, 1982.

——. *Guide to Investment in Bangladesh.* Dhaka : Board of Investment, Prime Ministers Office, March, 1998) P.104.

——. *Fifth Five year plan 1997-2002.* Dhaka : 1998.

——. *Fifth Five year Plan (Draft) 1997-2002.* Dhaka : 1997

——. *Bangladesh Quarterly.* Vol. 19. No. 2 Winter-December, 1998.

——. *Bangladesh a New Horizon for Investment.* Dhaka : Board of Investment, Prime Minister's Office, 1994.

The Bangladesh Observer. (April 21, 1999).

The Bangladesh Observer. (November 14, 1997).

The Bangladesh Observer (October28, 1988)

The Daily Ittefaq. (April 12, 1999).

The Financial Express, (February 1, 1999).

United states Information Services, *News Feature.*

Lall, Sanjaya. "Foreign Direct Investment in South Asia." *Asian Development Review,* Vol. 11. No.1 (1993).

Reza, Sadrel et al. *Foreign Private Investment in Bangladesh.* Dhaka : University Press Limited, 1991.

Reza, Sadrel. *Transitional Corporations in Bangladesh Still at Bay?.* Dhaka : University Press Limited, 1995.

Report of the Tasks Forces on Bangladesh Development Strategies for the 1990s, Managing the Developing Process. Vol.2, Mr. S.A.L. Reza (Conveynor). Dhaka : University Press Limited, 1991.

Ruffian,Roy j, "The Role of Foreign Direct Investment in Economic Growth of the Asia and the Pacific Region." *Asian Development Review,* Vol. 11No.1 (1993).

Sarker, Nihar K, (ed). *Foreign Investment and Economic Development in Asia.* New Delhi : Orient Long man Ltd. 1976.

W. Perch Davic. Macmillan *Dictionary of Modern Economics.* London : The Macmillan Press Ltd. 1986.

Zakir Hossain Dewan. "Investment Climate and trend of Foreign Investment in Bangladesh : A Study of Japanese investors" (Seminar paper). Dhaka : BPATC, 1997.

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol.13. June 1999. Ashar 1406

Managing Performance Challenges of the Public Sector HRD

Md. Shirajul Islam *

Background

Performance management forms an integral part of a management system. The goal of every management system is to get certain things done by its employees and naturally, the question arises how efficiently and effectively the work has been done. Some form of performance management system dates back to an "Imperial Rater" in the Wei Dynasty in the third century A. D. Industrial performance management approaches obviously came much later; they probably began in Robert Owner's cotton mills in the early 1800s (Rausch 1985 : viii). F. W. Taylor's scientific management techniques during early 20th century like setting job standards, time and motion study, job redesign, measuring individual performance, wages incentive plan are classical Models of performance management. The concept was gradually popularized and fairly adopted after World War-I for blue colloured employees and after Word War-II for managers and professionals. Now at the backdrop of the poor performance of the public sector of the developing countries, the concept has got reinforcement in a new fashion.

---

* Director, BPATC.

The commonwealth portfolio defines... performance management as...the means by which public service goals are linked to individual target-setting, appraisal, and development. It provides a strategy for delivering a higher quality service, and for increasing efficiency by enhancing accountability and individual motivation and improving communication to assist organizational change... Performance management builds on two major themes... Identifying the mission of an organization within the public service defines its broad objectives and intentions, and encourages a climate in which achievements are measured. (Commonwealth Secretarial 1996).Erwin views performance management as...a multistep process for encouraging, or stimulating performance which exists in every organization either formally or informally (1985 : 5).

Objectives

The major objectives of the paper are :

a. to evaluate performance standard of the Bangladesh public services; succinctly
b. to identify major challenges facing the public sector HRD; and
c. to suggest measuers for improvement of public sector HRD institutions.

Performance Standards of Public Service

Bangladesh before its independence in 1971 had been under British colonial rule for about 200 years and thereafter an wing of Pakistan for about 24 years (1947-71). Orginisational structure, rules, decision-making process and other instruments of administration inherited mostly from British-India through Pakistan, were adopted. Changes, introduced are mostly incremental and founded on British models or tradi-

tions. A study by Huda and Rahman (1990 quoted in Rahman, p.2) reveals that...nobody in the Bangladesh Secretariat could dispose of cases on time as prescribed by Rules of Business (GOB, 1994 quoted in Rahman, p-2). Project peparation, processing and implementation status over all the plan periods are unsatisfactory. Task Force Report pointed out that.....implementation delays increase project costs by 35-40% on average and prolong implementation period by 60% as compared to the time-frame anticipated at project approval (Task Force Report 1991 :219). The extent of project cost overrun may ranges from 100-over 700 percent (Table-1). The information basically derived from 1987-88 annual review by IMED.

Table-1 : Ranges of Project Cost Overrun

Cost Overrun	No. Of Projects
100-200%	57
200-300%	7
300-400%	6
400-500%	1
500-600%	2
600-700%	3
Over 700%	6
TOTAL :	82

Source : Skylark, Chadha, Managing Projects in Bangladesh : A Scenario for Development Projects.

An estimate reveal average cost of delay amounting to US$ 177 million per project (Chada : 1989 : 298). According to survey of 200 businessmen and 70 exporters, government

officials are unresponsive and oblivious to cost of delay ....two third of exporters have lost export orders due to delays in dealing with public agencies and, on average, exporters spend 7% of sales to expedite government decision making...Annual losses of public enterprises are staggering, about 2% of GDP, while their outstanding debt, a large part of which is non-performing and would have to be absorbed by the budget (i. e., future generations), accounts for 90% of GDP (World Bank, 1996 : XV)

The government officials in Bangladesh are reported to work 6 hours instead of 6 days a week (Rahman, 1994 :2). This signifies gross underutilization of human resources leading to unsatisfactory performance. The report of the administrative reforms committee termed that "it is a non-performing government" (UNDP, 1993 quoted in Rahman p. 2). Critics of the civil service today argue that most civil servants are impervious to public sensitivities, highly bureaucratic and self-serving; and increasingly incapable of managing a modern government within a pluralist democracy (World Bank, 1996.iii).

Public Sector Human Resource Development Policy

Since independence of Bangladesh 1971, government ascribed top priority to the HRD. The first five year plan (1973-78) of the independent nation emphasized the need for training of the officers and staff at all levels. In addition to the training institute inherited from Pakistan, a new training institute called BASC (Bangladesh Administrative Staff College) was set up for the joint secretary and equivalent officers. This was the first time that a high level training institute was established. Subsequently GOTA (Gazetted Officers Training Academy) was reorganized and renamed as COTA (Civil Officers Training Academy). Finally, an integrated training

management system was founded in 1984 with the merger of the following four institutions (Table-2). The newly emerged institution was renamed as BPATC (Bangladesh Public Administration Training Center).

Table-2 : Institutes Amalgamated as BPATC

Institute	Year Founded	Level of Participants
a. Bangladesh Adminitrative Staff College (BASC)	1977	Joint Secretary and Equivalent
b. National Institute of Public Administration (NIPA)	1961	Mid-level Officers (Deputy Secretary & Equivalent)
c. Civil Officers Training Acadimy (COTA)	1961	Newly Recruits of Civil Service
d. Staff Training Instutute (STI)	1963	Clerical Staff

Source : Ali Ahmed, Bangladesh Public Administration Training and Sevior Civil serveant (Dhaka, BASC, 1984) P. 191-224

In Bangladesh there are more than 300 training institutes in the public sector. Most of these institutes provide skill based training to their own departmental officers and staff. Some training institutes like BPATC provides training to all cadres and services at all levels to meet common professional needs of the government.

In 1981 a National Training Council was set up to formulate a public sector training policy. In 1983 a draft policy was formulated for government officials only covering only incountry training. Thereafter, in 1986 a comprehensive draft national training policy was designed. Unfortunately, the draft policy is still being followed in the public sector with certain modifications issued from time to time. Recently,

government has drafted a new training policy where participation of both public and private sector representatives were incorporated. The draft policy is awaiting approval of the government.

Challenges of the Performance-oriented HRD in Public Sector

Bangladesh, after its independence, inherited significant number of abandoned industries. Production, market and other installation capacities estimated based on internal demands of both the wings (East and West) had sharply declined after the independence. Owners, managerial and technical experts who were Pakistani had left Bangladesh. Consequently, a vacuum in managing and organizing the industrial sector, developed. Government had to take the responsibility of running the abandoned industries by forming public sector corporations. The management of these public sector corporations vested sometimes, on inexperienced, politically appointed managers. At the same time, government had to absorb, in the public sector, huge number of repatriates and political motivators, freedom fighters and employees of the exile governments. They were indiscretly placed the public service. HRD programmes to meet the public service management challenges, could not be introduced because of the prevailing socio-economic and political situation of a newly born war ravaged country.

After independence, Bangladesh visualized unstable government. Military rule and military rulers under the banner of democracy ruled the country for a fairly long time. Democratic institutions, a cluture of fair and neutral elections did not grow. National plans setting development goals were not consistently adopted and implemented. National consensus between political parties on common issues has not yet been

founded. Thus, setting of public sector performance standards and measurement of the output is still in a state of fluidity.

New global economic reorientation process evolved over a decade have enhanced interdependency and competition between nations and organizations. To meet the emerging challenges, every organization, whether government or non government, must operate efficiently and respond quickly to customer needs. This reinforces the need for demand driver HRD programmes for all managers and staff employees.

1. Traditional Organizational Design

Training Institution's structure and decision making process are as traditional as the administrative ministries. The tall hierarchy created role overlaps and turned the training institutions into inefficient organizations. Superfluous policy-making bodies like Board of Directors or Governors delays decisions resulting in poor performance. The legal framework (the presidential ordinance) on which the institutions were usually founded lacked visions. The role of the Board of Directors or Governors and the head of the training institutes are ambiguous and overlapping. The goals and functions of the training institutes are also lacks specificity. An external mid-term evaluation on public sector training commented that : BPATC and other Public Sector training institutions suffer from inherent structural and institutional problems... (Ahmed, 1994 : vi).

2. Lack of Integration between Recruitment and HRD Programmes

There is wide gap between public sector recruitment and HRD programmes. The recruitment and selection processes are not founded on scientific human resource demand

forecasting models. Consequently, unplanned growth of the public sector created heavy pressure on the HRD Institutions. The table-3 depicts 100% increase (from 78,685 in 1971 to 9,46,749 in 1992) of public sector human resources in 21 years time span. The number of BCS officers have also increased by 607% (from 11,130 in 1971 to 78,685 in 1992) within the same period.

Table-3 : Employment Growth of Civil Service.

Class	1971	1982	1986	1992
BCS	11,130	56,100	60,106	78,685
1	12,320	187,700	32,042	36,858
11	245,500	308,700	594,.300	579,842
111	185,500	226,500	386,406	251,364
Total	454,450	770,000	1,072.854	946,749

Source : Government That Works : Reforming the public Sector, World Bank, Dhaka 1996.

Table-3 reveal year-wise statistics of BCS recruitment form 1973 to 1996. The table depicts average 1207 annual recruitment.Unfortunately, the BPATC, on whom the responsibility of foundation training of newly recruited civil servants were legally ascribed, can provide 4 months foundation training to maximum 600 officers annually. The backlog (600 persons) is thus shifted to other public sector training Institutes whose legal role and functions were different. This policy temporarily helped to control the backlog ,and negatively affected their own performance. Inter-cadre interactions for dispersed foundation training have also significantly diminished.

Table-4 : Year-wise Statistics of Recruitument in Bangladesh Civil Service

Year of Examination	Number of Appointment
1973	353
1977	1344
1979	130
1981	130
1982	977
1983	2004
1984	765
1985	2499
1986	2078
1988	1081
1989	932
1990	705
1991	1127
1992	1849
1993	2516
1994	1127
1995	827
1996	1270
Total	21714
Average	1207

Source : Ministry of Establishment

Role of all the public sector should be reviewed and analyzed keeping in view the global challenges, market competitions, societal needs, citizen expectations and other environmental conditions. Human resource demands of the public sector

should be scientifically forecasted and recruitment, selection, socialization and HRD programmes be redesigned and readjusted accordingly.

3. Inadequate Faculty Development Opportunities

Prior to professional contributions, each faculty should get a fair chance to develop himself. Unfortunately, no budgetary provision subsists for faculty development Residual fellowships as trickle down from ministry to training institutes are misallocated and less potential trainers are sent abroad for study. The HRD fellowships are not directed toward institution building. Usually supervisors tend to recommend subordinate officers for overseas training on the basis of their personal preferences rather than merit (Ahmed 1994; 14). After training the trained officers fails to meet the professional challenge.

4. Ambiguous Job Description

Job descriptions are standards of job that a jobholder must meet. Job rotation, performance measurement and appraisals are organized according to specifically defined job descriptions. Unfortunately, in many training institutions either these documents are lacking or have been designed traditionally. These traditionally designed job descirptions... lacked clarity, precision, completeness, rationality and above all realism (Shiraj, 1996 : 32).

Unless a job holder clearly knows what is expected from him, it is unlikely that the can effectively perform his role. Moreover, he will not know why and how he should perform and to whom he should report, cordinate, communicate and above all to whom he is accountable.

Al these are preconditions for effective job performance. Job study and analysis of each position need be scheduled to

make the public service HRD performance oriented. Main job output and performance standard can thus be objectively determined.

5. Uncertain Career Path

Service conditions and career opportunity of HRD professionals mostly are inferior to other services. There are innumerable precedence that HRD professionals remain in a same position for more than 15-16 years. It sometimes happened that a HRD professional who was supervisor to a cadre officer has subsequently became subordinate to the same officer. Moreover, their career progression is fixed upto certain limit. These conditions result in increased employee turnover, low motivation, low commitment and low morals, high frustration and other negative psychic symptoms. Specialization and professionalism, innovation and creativity, development of need-based curricula and training methods and above all the institution building process is seriously hindered. Thus progressive service conditions, promotion policy, service terms and staffing plan based on interest, aptitude and specialization should be introduced for HRD professionals. Every HRD professional should have fair chance to reach the highest level within his institution based on his professional contributions like research, publication and service seniority.

6. Non-rewarding Work Culture

The work culture of the training institutes are non-professional. Professional achievements are not counted for promotion and fellowship awards. Disposal of a files, writing a note and other administrative communication get precedence over conducting training sessions. Trainers are mostly burdened with administrative jobs. Consequently, the quality of professional standards declines.

Training institutes, sometimes, are used as damping grounds. Civil servants disliked by government in power are damped to training institutes. The performance of such unwilling personnel dampens the professional work culture.

7. Inherent Limitations of Public Sector Performance

In manufacturing sector, quantity and quality of output can be determned objectively than public sector services. Public sector performance standards and measurement process has inherent limitations. The tasks performed by public sector is mostly subjective in nature. Rigid rules and regulations, absence of reward system, lack of freedom and autonomy, diminished the chances to introduce performance-oriented public sector HRD. However, job analysis information, job descriptions and other objective job criteria can be designed to improve productivity and performance.

8. Loosing Couping between Public Sector and Performance

Druker has pointed out that the typical public service institution has traditionally had monopoly powers so that the intended beneficiaries have had no choice (quoted from handout of Shafiullah). Recruitment rules for civil servants made the foundation training compulsory. Services of the new recruits of civil service shall not be confirmed unless this mandatory training is undertaken. Consequently, huge number of participants usually from 150-200, are sent to BPATC for such training. The quality and customers' needs and expectation remains subservient to monopolistic power of training institutions.

Recommendations

1. Analysing jobs

In-depth study of jobs should be undertaken for each HRD

institutions to create a HRD data base for planning and decision making. Job description, identification of training needs,. designing objective performance appraisal system, designing need based curricula should be synchronized with job study information.

2. Human Resource Planning

Role and functions of all the public sector agencies should be reviewed and analyzed keeping in view the global challenges, market reorientation, citizen expectations, societal needs and other environmental conditions. Human resource demands of the public sector should be scientifically forecasted and recruitment, selection, socialization process and HRD programmes be redesigned and readjusted accordingly.

3. Organisational coufiguration

To improve the performance of the public sector HRD, tall hierarchy that delays decisions and complicates communication and coordination process, should be replaced by flat hierarchy. Superfluous organs like Board of Directors or Governors should be given full autonomy and freedom or otherwise eliminated.

4. Redesign job Description

Present structure of the job description should be made comprehensive. Accountability, coordination, communication and other organizational relations and authority should be clearly spelled out for in each individual job description.

5. Faculty Development Programme

HRD institute should be allowed to invest adequate amount of money in inhouse faculty development. Separate line item in annual budget may be introduced for each HRD institutes. Moreover, the institute head may be given full authority to directly explore donor funds for faculty development.

6. Carcer Planing of HRD Professinals

In order to reduce frustration and turn over rate, develop motivation, morality and commitment of HRD professionals with concurrent developemnt of specialization, professionalism, innovation and creativity, need based training curricula and training methods, progressive service conditions, promotion policy and staffing policy based on individual interest and specialization should be introduced for HRD professionals. Moreover every HRD professional should get the chance to reach the highest level within his service career based on his professional contribution like research, publications and service seniority.

7. Leadership in HRD Institutes

HRD professional should not be burdened with administrative tasks. Colleagial leadership and work culture be built in HRD institutes. Persons with outstanding academic background having aptitude in HRD should be posted in HRD institutions. Leadership positions of the institutes, however, should be manned by HRD professionals so that institutes culture, policy and professional work get right sense of direction.

8. Freedom and Autonorny of HRD Institutes

All institutions engaged in HRD activities should be made free from the control of the administrative ministry. Each institute should have its own service, financial and other operating rules for decision-making. The board of Directors or Governors should be reconstituted by HRD professionals instead of ministry representatives. NGO, private sector and political representatives should also be included in the Board of Directors or Governors.

Conclusion

Challenges of the public sector HRD in a developing country like Bangladesh are multiple. No one can make an exhaustive inventory of such challenges. In this short paper some fundamental issues were raised and solutions proposed. The author believes, if these recommendations are transformed into appropriate policies, these would significantly contribute to the efficient and effective management of the public sector HRD programmes.

Bibliography

Ahmed Ali, Bangladesh Public Administration Training and Senior Civil Servants (Dhaka : BASC, 1984)

Bahaman Mastiff A. Changes in the Public Administration and Productivity Improvement in the Public Service (Dhaka : BPATC 1994)

Current Good Practices and New Developments in Public Service Management (Commonwealth Secretariat, 1996)

Government of the Peoples' Republic of Bangladesh, National Training Policy (Dhaka : Ministry of Establishment, 1986)

Government That Works : Reforming the Public Sector (Dhaka : The World Bank : 1996)

Islam Md. Shirajul, Designing Job Description and Job Specification in PROSHKHAN, Journal of BSID, Vol. 3, No.2, July-December, 1996 (Dhaka- : BSID, 1996)

Public Administration Training Policy, 1998 (draft)

Rausch,Erwin Win-Win Performance Management/Appraisal (New York : John Wiles & Sons, 1985)

Report of the Task Forces on Bangladesh Development Strategies for the 1990s, Volume-2 (Dhaka : University Press Limited, 1991)

Shafiullah A. N. M., Handout on TQM in Public Sector

UNDP (1993) "Report on Public Administration Sector Study in Bangladesh (Dhaka : UNDP, 1993)

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol.13, June 1999, Ashar 1406

Contracting Out in the Public Sector : Concepts and Issues

Rizwan Khair *

Introduction

As we stand at the brink of the next millennium, the future of the state has reached crucial crossroads. The state is under intense scrutiny. Basic questions regarding its role, size and operations are being raised and there is a growing consensus about its limitations and capabilities. During the 1950s and 1960s, when the public sector had the primacy as the creator and implementor of development strategies, public enterprises was used by the state both as a producer and provider of goods and services. However, during the last fifteen years or so, criticisms about the supremacy of the public sector both in academic and political circles have increased considerably. There have been calls for 'rolling back the state', 'shrinking the state' and giving the market a greater leeway rather than the state controlling the market. In fact, the relations between the state, market, non-governmental sector and the citizens have changed considerably during the last decade. This has paved the way to reexamine the role of the public sector in a different light. Nowadays it is being seen more of facilitator who steers others who can

* Depauty Director, BPATC

deliver better services and acts as a catalyst to inject competition in service delivery.

Thus governments across the globe are searching for ways for improvements in the public sector. In some, the state has been rolled back considerably while in many the public sector is being changed albeit slowly by employing many tools and options. As such, greater use of markets is creating competitive pressures and offering more alternatives to public provision for users seeking quality or lower cost. Among the various choices is one where governments are operating performance based agencies in the public sector and entering into formal contracts with them by providing required management flexibility and at the same time making them more and more accountable for outputs/outcomes. Moreover, governments are also entering into contracts with private firms or NGOs for provision of certain goods and services.

The focus of this paper, therefore, is to give an overview of the concept of contracts and then point out their strengths, weaknesses and effectiveness when used in the public sector.

Contracts : The Concept

The linkages between the government and the governance of public enterprises have been subjects of discussions/debates since the inception of public enterprises (PEs).

However, in an era of privatization and downsizing the government, various instruments have been developed (originally in certain European countries like France) to change the relationship between government and PEs. These instruments are known as 'contracts'. They were devised to rationalise vague objectives of PEs, enhance management autonomy and reduce excessive controls of governments. They

are, in fact, alternatives to the concept of direct control by the government and attempts to avoid the defects of the traditional regulating action/mechanism. The contract becomes an instrument through which relations between parties (government agencies, private sector firms or NGOs) are managed and regulated. Contracting out is also described by many as operational privatisation.

Contracting arrangements are often associated with decline in evaluation of programme outcomes and when assessment of client outcomes and quality of services of public sector organizations have been avoided due to political and technical difficulties.

What then is a contract? Terminology varies from country to country and over a time period within a country, e.g. it is known as 'contract de programme' in France, 'competitive tendering' in U. K. and 'memorandum of understanding' in India. However, the essence of them all are that contracts are "Procedures to make state-owned enterprises more independent of their sponsoring departments and to embody the mutual understandings of both sides in a formal contractual agreements." (Drumaux, 1994 : 103). Nellis (1991 : 279) described it as a negotiated agreement between the government, acting as owners of state-owned enterprises and the enterprises themselves. There are other definitions given by the authors like Ascher (1987) and Alford & O'Neill (1994). However, for our purpose, we will focus on the World Bank definition of contract as *"an agreement between the government and another party based on shared expectations about obligations and outcomes"* (World Bank 1995 : 107). The distinguishing factor between a contract and a set of directives imposed by owners of a firm or from a corporate plan designed by enterprise itself, is that the contract spells out

the obligations and limitations of both parties. Normally activities related to audio-visual services, maintenance, catering, cleaning services, construction, IT management, estate management, publicity and marketing, R & D, security services, market research, transportation, etc. are contracted out.

An Overview of 'Contracts'

Due to variations of focus, opinions seem to vary on the types of existing contracts. The World Bank (1995 : 107) identifies three types of contracts, which are relevant to PEs. They are (i) **Performance Contracts** involving the relationship between government and public managers with a focus on performance. (ii) **Management Contracts** which define relationships when the government contracts management of the enterprise to private management, and finally, (iii) Regulating **Contracts** between the government and a private regulated monopoly (World Bank Research Report, 1995). The World Development Report (1994 : 42) on the other hand, identifies yet another type of contract known as (iv) **Service Contracts** that involve transfer to private providers the responsibility for delivering specific services at lower costs or obtaining specific skills or expertise lacking in the public sector.

Performance Contract is based on the negotiations between government representatives and enterprise managers, setting out intentions, objectives and responsibilities. A typical performance contract may specify enterprise objectives in terms of desired socio-economic impacts, production goals, and/or quantitites and quality services to be provided. It defines policies and directions regarding size of personnel, social or non-commercial activities of the PEs. It also lays down the PE's financing and investment program detailing

the contribution of the enterprise, the government or from credit sources (Nellis 1991 : 280). Performance contract is advocated as a mechanism to smooth PE and government interface and as an alternative to privatisation especially in cases where PEs are financially viable.

This kind of contract originated in France in late 1960s and later on theirs use spread to Francophone Africa and in recent years in varied form to some countries in South America and South Asia. The World Bank Report (1995) notes that this form exists in 32 developing countries and that China has the maximum of such contracts (almost 100,00). There are basically two types of performance contracts, i. e. (i) French System-which is prevalent in France, Francophone Africa and Latin America; and the (ii) Signaling System which initially started in Pakistan and Korea but is now prevalent in Bangladesh, India (where it is know as MOU), Nigeria, Ghana, and many other countries. The difference between the two is that in the French system weights are not allocated to targets. Thus there is no distinction between targets in terms of emphasis and as such performance evaluation is affected by subjectivity. In the Signaling System used in Pakistan and Korea, the system aims at motivating management to maximize returns on the sunk capital. In Bangladesh, till 1994, 20 public enterprises were under performance contracts with one of them starting as early as 1986 (Mazumder 1994 cited in Commonwealth Secretariat 1995).

The World Bank Report points out the existence of management contracts in 44 developing countries. It is an instrument for improving PE performance and where outright privatisation is desired- it is used as a 'preparation phase' before the final sale to the private sector. The World Bank

(1995 : 134) defines management contract as "an agreement between the government and a private party to operate that firm for a fee (usually a success fee, but sometimes for a fixed fee as well)". As such, the government does not receive a fixed rent (as in the case of lease); is responsible for fixed investment of the enterprise and it holds majority ownership in the enterprise. It is distinct from a joint venture-where the government may or may not hold majority shares. It also includes contracts where a private contract provides working capital or owns a minority equity share in the enterprise.

This kind of contract is predominant in the hotel industry. It is also found in agriculture, and especially in Sri Lanka which has a maximum number of such contracts mostly related to the tea and rubber plantations. No country relies extensively on them, and the biggest number of such contracts are found in Africa mostly in enterprises which were formerly owned by multinational companies. This probably could stem from the concept that enterprises operate well under private management, as well as due to paucity of public sector technical expertise (Ibid. : 133-134). Recently, in Bangladesh the management of Bangabandhu Jamuna Multi-Purpose Bridge was contracted out to a private company.

Regulating Contracts are increasingly being used in monopolies like telecommunications, electricity, transportation sectors and other infrastructure, which are being privatised. It provides a flexible and cost effective tool increasing responsiveness to users and taps expertise too expensive in the public sector. Regulation Contracts provide sufficient incentives to persuade the new owner to invest, expand services, and operate the firm efficiently, while protecting consumers form exploitation of the monopoly (ibid : 108 and 150). This kind of contract may include explicit agreements about

pricing or performance and implicit expectations about the extent of the power of regulators.

We believe **Service Contracts** to be quite distinct form **'Management Contract'** as mentioned by the World Bank (1995), since this type of contract entails only certain specific functions/services. Moreover,it permits more healthy competition among multiple private providers of services and its most common form is used in maintenance services, design and construction of major infrastructure works. This type of contract is also used for acquiring standard professional services like auditing, data processing, catering, cleaning, fee collection and even recruitment. The concept was first inspired by the Japanese auto industry and allows enterprises to concentrate on building up their skill base and meeting the needs of the customer without being tied up in doing everything themselves. Recently in Bangladesh, janitorial services in several important government offices (like PM's Office), railway services on certain lines and the transportation services of the government run transportation corporation (BRTC) have been contracted out on basis of service contracts.

Contracts : Do They Really Work?

Even though contracts have in vogue for quite sometime, but the heart of the matter is whether 'contracts' are effective. As Alford and O'Neill (1994 : 18) ask "is the Contractual Model-with its foundation in unambiguous incentives and penalties, its focus on outputs rather outcomes, and its linear form of accountability-the best way to move public management forward....?" They contend that the answer to the above is relative and the issue whether it is better or worse than the alternatives. Experience and research (Nellis, 1991; Stewart and Walsh, 1992; Shirley and Nellis, 1991; Prager, 1994;

Drumaux; 1994; Mol, 1989; Alford and O'Neill, 1994; and World Bank Reports 1994 & 1995) indicate that although the concept is not a panacea, it still is effective. Moreover, not all government activities can be subject to contracts. The World Bank Research Report of 1995 points out that factors of information, rewards and penalties and commitment are crucial incentives which contribute toward the success of contracts. Effective contracts are those that include effective mechanisms for exchange of information; are bounded by rewards and punishment for both parties to exchange information and comply with contract provisions, and that the parties involved should be convinced of the commitment of each other.

Let us now examine the different kinds of contracts. Performance Contracts have several disadvantages. Shirly and Nellis (1991 : 22-24) point out that governments can and often violate them. Moreover, they are complex and take a long time to negotiate and put a burden on the limited supply of skill and information in most of the developing countries. As targets fixed in many cases are flawed or soft, a firm attaining its contracted economic target is not necessarily operating more profitably productively. For most PEs, rate of return on assets reflect government behavior instead of management behavior-as the government still control wages, input-output prices, etc. In fact, the World Bank Report (1995 : 118) indicates that in terms of total factor productivity, performance contracts seem to be doing as much harm as good. They point out that PE managers have an information advantage, which they use to negotiate easy targets, as rewards and punishments do not motivate them to perform better. Moreover, governmental constraints hamper the autonomy of management, and contracts often do not specify enforcement

mechanisms. Political processes also often hamper the proper functioning of contracts leading to undermining of government commitment. In case of Bangladesh, only one out of the 20 enterprises having performance contracts showed consistent improvement in its performance. Here political interference and linkages between the trade unions and the government, absence of clear direction/vision of the controlling ministry, shortage of trained manpower and lack of political will have been identified by a analyst (Mazumder 1994).

As a result, the World Bank declares that there is little support to the premise that detailed performance contracts improve PE performance. This led Nellis (1991), Commonwealth Secretariat (1995) and the World Bank Report (1995) to suggest the following lessons to be taken into account in case of implementing performance contracts :

- Performance contracts should be short, single and flexible.
- They should be used sparingly and only when the government's commitments are clear.
- Contract to be effective must ensure the acceptability of those who are involved in its implementation process.
- None of the parties involved in the contract can have goal incongruent behavior and interests.
- The outcomes of the contract depend not only on management incentives but also on the power and quality of government negotiations involved.
- The involvement of outsiders (3rd party) may help prevent reneging of commitments.

Shirley and Nellis (1991), therefore, aptly comments that the performance contract should be a part, rather than the

foundation of any reform effort and that negotiation of such contracts should be a part of the governments budgetary process, otherwise it is disregarded in budget decisions of the government.

Compared to performance contract, the World Bank favors management contract as a tool for improving PE performance. It points out that in terms of productivity and profitability, management contract fare well. Competition plays an important role in the availability of information, which in turn is used to shape rewards and punishments (in terms of power and money). However, management contracts work better in some sectors than in others as they have lower political costs than privatization and they have lower political gains. In fact, management contracts work well under the following circumstances (World Bank 1995 : 139-150):

- When the contracts are bid competitively.
- When both parties face risks.
- The contractor is given success fees from profits and has the autonomy take actions needed to improve performance.
- Proper encouragement of the donor community by appropriate financing

However, the use of management contract in PEs raises the question of accountability. Such a process removes some of the norms of public accountability, as the management of PEs is only contractually accountable (Walsh and Steward 1992: 514-515). Moreover, the limitations of applicability in all sectors delimit the extensive use of this kind of contract.

Regulatory contracts involving the government and owners of private monopolies (regulated by government) are most

successful when governments reduce the enterprise's information advantage by increasing competition; devise rewards and penalties primarily in the form of pricing regulations that induce the enterprise to operate efficiently and pass on some of the savings to the consumers (in terms of reduce prices). And finally, the government ensures adequate safe guards to protect the private producers from unwarranted attitude/ actions from future regimes-so as that they invest in the enterprises (World Bank 1995 : 151-152). Nevertheless, in spite of variances, there is improved productivity in enterprises after introduction of regulatory contracts. The difficulties arise when countries failed to tackle the preconditions stated above. Moreover, some differences due to country based peculiarities cannot be removed in the short run. Moreover, regulatory contracts are difficult to design, but even with imperfections in design, important gains can be made (Ibid. : 168-169).

Service contracts are more cost effective. They do not involve handing over the entire management to the private sector, and only 'unbundling' some of the non-core activities/services on to the private sector. Therefore, the criticisms of accountability that are raise in the case of management contracts do not arise in this case as the enterprise remains public, while its services to its customers improve.

According to World Bank (1995), management contracts, regulatory contracts and service contracts function more effectively than the pioneering performance contract. However, choosing the right kind of contract instrument depends on the sector and specific characteristics of the country in which they are to be utilied. In addition, ways and means should be found to improve the effectiveness of performance contracts-the only form of contract where the overall scope and dominance of the public sector remains.

Conclusion

Contracts enhance competition in the market. In places where competition in the market is not feasible, it might still be possible to foster competition for the market by usage of contracts. There the government can play a crucial role by striking a balance between regulating and facilitating economic activities and services. Even in developing countries, where both markets and states are weak, competition can be managed through contracting out.

According to the literature surveyed in this paper, experiences with contracts indicate that they do achieve results but they are certainly not the panacea for all the ills of PEs. The bottom line is that contracting can work for public sector reform only if incentives are aligned so that the government and public enterprise management can strive together for greater efficiency. As management of public services has to be grounded in the purpose and conditions of the public sphere of activity, one has to be careful in choosing the right instruments in achieving the best possible results under the prevailing circumstances. Prager (1994 : 183) therefore aptly remarks that government policy makers must approach the concept of contracting out on pragmatic, not ideological grounds. Some activities may be more cost effective when contracted out, others will not. And the challenge for public authorities is to distinguish them. That is why Alford and O'Neil (1994 : 164-165) at the end of their analysis in their book 'The Contract State' do not offer a definite answer to the question whether 'contractualism' was the best answer for public management. They conclude that there is no one best way to manage a diverse and complex entity as the public sector, and that a contingent approach is more sensible.

In fact no one claims that contracting out government functions is the best option for increasing productivity as

there are costs and complexities involved in enforcing and monitoring contracts. Therefore the best way for determining in the effectiveness of 'contracting out' is to examine them on case by case basis.

However, certain considerations need to be borne in mind when introducing contracting out in the public sector. And they are :

- Level of government activities, which are proposed to be contracted out-at lower levels activities are less complicated and can easily be contracted out.
- Existence of competition.
- Contracts can be determined by price.
- Existence of in-house capabilities, in which case it is often pointless to contract out.
- If the organizations under consideration of privatisation, then contracting can act as an intermediate stage where the scope of privatisation can be assessed.
- Whether the market has necessary competence to offer services to be contracted out. (Kaul,1998)

The policy makers and planners must also take into account the possibility that contracting out may expose certain socioeconomic sectors of a country to foreign interests as they may take part in the tendering process. In such cases care should be exercised so that strategic and sensitive areas of a country are not opened up for contracting and that the domestic economy may not be adversely affected by global developments.

Given the complexity and diversity of the situations in which contracts are to operate, government must take into account the nature and scope of the public sector, the concept of equity (which contracting cannot uphold) and the question of

accountability before taking concrete decisions about contracting out products and services provide by the public sector.

References

Acher. K (1987).The *Politics of Privatization : Contracting Out Public Services*. Macmillan Education Ltd. London

Afford, J. and O'Neill (1994), *The Contract State : Public Management and the Kenneth Government*. Center for Applied Social Research, Deakin University, Australia.

Batra, G. S. and Batra, S. B. (1995) 'Memorandum of Understanding : A Strategy for Restructuring the Public Sector in India' *Management Development*, Vol. 24, No1.

Commonwealth Secretariat (1995) *Performance Contracts : A Handbook for Managers*. London, Commonwealth Secretariat.

Drumaux, A (1994), 'Management Contracts and the Regulations of Public Enterprise, *International Review of Administrative Sciences*, Vol. 60, No. I, March 1994: PP. 103-1115.

Kaul, Mohan (1998) *Introducing New Approaches : Improve pullic Service Delivery*, London, Commonwealth Secretariat.

Mazumder, M. A. K. (1994) 'Performance contracts in Bangladesh : A Case Study', in *Performance Contracts : A Handbook for Managers*, London, Commonwealth Secretariat

Nellis, J. (1991), 'Contract Plan : A Review of International Experience, Ramamurti, R. and R. Vermin (Ed), *Privatization and Control of State-owned Enterprises*, The World Bank, Washington, D. C., pp. 279-323.

Nico, M. (1989), 'Contract-based Management Contract in Government Organizations, *International Review of Administrative Sciences*, Vol. 55, No 3, September 1989, pp. 365-379.

Peachment, A. (1997) 'Contracting for Services : Case Studies in Stereo plotting, Quarantine Inspection and Hospital Consultancy' *Asian Review of Public Administration*, Vol. IX, No 2, pp. 50-63.

Prager, J. (1994), 'Contracting Out Government Services : Lessons from the Private Sector, *Public Administration Review*. Vol. 54. No. 2 March/ April 1994, pp. 176-184.

Shirly. M. and Nellies. J. (1991). 'Determining the Role. Scope and Objectives of the State-owned Sector. *Public Enterprise Reform-The Lessons of Experience*. The World Bank. Washington. D. C.. pp. 16-24.

Steward J. and Walls, K. (1992). "Change in the Management of Public Services. *Public Administration*. Vol. 70. No.4. pp. 499-517.

World Bank (1994). *World Development Report : Infrastructure for Development*. Oxford University Press. Oxford.

World Bank (1995). *Bureaucrats in Business- The Economics and Politics of Government Ownership*. Oxford University Press. Oxford.

World Bank (1997). *World Development Report : The State in Changing World*. Oxford University press. Oxford.

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol.13, June 1999, Ashar 1406

Empowerment of Women : Problems and Issues in the context of Bangladesh.

Golam Mostakim *

Bangladesh : An Overview

The emergence of the sovereign People's Republic of Bangladesh in December 1971 was the successful culmination of a long and arduous struggle for self-expression by the Bengali nation in the years between the partition of the Indian subcontinent in 1947 and the initiation of a systematic policy of genocide by colonial Pakistan in 1971. In more ways than one, Bangladesh was the fulfilment of a national dream, indeed a restoration of the cultural legacy that was sought to be swept away in the face of a spurious movement for politics based on motives that could not and would not redound to the benefit of the masses.

In 1971, therefore, the choice that the country faced was simple: it could go on being part of a political dispensation that ignored Bengali aspirations despite the all too clear triumph of the people at the general elections of 1970 or it could chart a course that would hasten its progress to an independent clime. The nation, under the inspiring and dynamic leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, chose that latter course. It was only natural, given the fact that in the years since the Pakistan ruling circles first

* Director: BPATC

entertained the nation of the state language of Pakistan being Urdo (to the detriment of the Bengalis who formed no less than fifty six per cent of the country's population) a counstant and consistent struggle had come to symbolize the spirit of the Bengali as the years came on. Following the dramatic and groundbreaking movement for Bangla to be elevated to the status of a national language. Bengalis began to define in clear perspective their national priorities.

Through the fifties and the decade-long dictatorship of Ayub Khan, the Bengali struggle was sustained through a careful enumeration of history and the cultural legacy the people were heir to. In 1966, the vision became clearer, through an articulation of the Six-Point programme for autonomy outlined by Sheikh Mujibur Rahman. The essence of the message was simple, which was that if the Bengalis were to carve a place of their own in the political set-up, the entire set-up needed to be transformed.

It was a change that the rulers were not willing to consider. What followed was unmitigated repression, the focal point of which came to be the infamous Agartala Conspiracy Case through which the ruling circles sought to make a dent in the Bangalee spirit, especially that of Sheikh Mujibur Rahman. But revolutions always have the unusual quality of thwarting the various degrees of meanness brought into the task of diverting the attentions of people towards things of baser quality. The Bengalis emerged triumphant when the dictatorship tottered and then collapsed. But all was not achieved yet: and when the new dispensation, a sequel to the one that had fallen, tried subverting the democratic process by a calculated plan and operation of genocide between March and December of 1971, Popular resistance took shape in the form of organized armed struggle. The incarcerated national

leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, served as the pivot of the struggle for the emancipation of the country. And in consonance with his directives, the provisional government formed in Mujinagar on 17 April 1971 carried the struggle forward. It was a struggle that could not but culminate in victory. Despite the genocide extermination of as many as three million people and the outrage committed on no fewer than two hundred thousand women, the people of the land stood witness to freedom on the afternoon of December 16, 1971.

The surrender of a hundred thousand strong Pakistani occupation force was the beginning of a new dawn for a country that has not swerved from its consciousness of history. The sad part of the story of independent Bangladesh is that it was forced, through intrigue and organized conspiracy, to revert to darkness within three and a half years of liberation. The assassination of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, along with the members of his family, on August 15, 1975,was a most terrible act that would keep the Bengali its grip for a long period of twenty one years. The killing in prison, in that same year, of the four national leaers- Syed Nazrul Islam, Tajuddin Ahmed, M. Mansoor Ali and A. H. M. Kamruzzaman only strengthened the feeling that the country had once again fallen prey to well- planned conspiracy. After that, the moot question was one of how soon and how effectively the country could return to its historical moorings. The struggle for a return to democracy and the secular principles that had guided the nation towards the achievement of victory in 1971 was soon in force, through it would take a long time for the country to reclaim the old glory. Between the conspiracy of 1975 and the reemergence of secular democracy in 1996 lay a long trail of dictatorship and all the negativism such

dictatorships leave in their wake. Therefore, once it became clear that the forces which had shaped and conducted the struggle for freedom in 1971 were finally again triumphant in the elections of June 1996, the imperatives.became patent. The need was to restore government to a state of dignity, to give the country back to the people whose sacrifices alone had gone into the achievement of freedom and the restoration of democracy after the years of unaccountable governance. The principle of government by Prime Minister Sheik Hasian, was in place.

Bangladesh today is a reflection, in essence, of the rich cultural and political tradition that once defined its ethos. Its villages shape its thoughts, and ideas come in the nuances of its poetry, in the romance of its music. The spirituality of the land, as symbolized by the tales of Hazrat Shah Jalal and others, has consistently worked to deepen its mystic quality. In the works of such writers as Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam and Michael Madhusudhan Dutta are embodied the qualities that shape the personality of the Bengali. Nature works wonders across this land; and nature also wreaks havoc. When it works in that manner, first as an inspiration to the growth of the soul and then as a challenge to the power of individual and collective endurance, it brings forth the resilience of the spirit that has for ages shaped Bangladesh and its people.

It is a land of laughter and deep, well-wet convictions that come through in the patterns made by the criss-crossing of the rivers across the landscape. And the rivers and many. They speak s single language. The language is one of power emanating from core beliefs, beliefs that have given Bangladesh its persona.

Bangladesh has been aptly described as a new state in an ancient land. Much has been written about past glory of

Bangladesh, notably in old records like the evidence of Pliny and Periplus of the Erythrean Sea (first century AD). it was drawn in Ptolemy's map. These indicate that from the earliest times Bangladesh was known to the West, particularly for its muslin, the finest fabric the world has ever produced.

Travellers and scholars who were attracted by the charms and face of Bangladesh since time immemorial had showered effusive epithets on its bounties and wealth, affluence and prosperity, craftsmanship and cultural advancement. They include the Chinese travellers-Fa-hen (fourth century AD), Hue-an-tsung(seventh century), Ma-hoen and Fe-shin (fifteenth century), Ibne Batuta fourteenth century)) form Africa, Nicola Kanti (fifteenth century) and Ceasar the Frederick (sixteenth century) from Venice, Verthema, an Italian in the sixteenth century, Barbosa and Sebastin Manric (sixteenth century) from Portugal, Travernier and Bernier from France (seventeenth century) and Queen Elizabeth-the First's ambassador Ralf Fish.

To Ibne Batuta, Bangladesh was "full of bounties and wealthiest and cheapest land of the world". So great were the attractions of Bangladesh that to quote Burner "it has hundred gates open for entrance but not one for departure". Ladies of Imperial Rome were literally crazy for Bangladesh's Muslin and luxury items, which according to Pliny, resulted in serious drain of gold of the Empire. Because of its location, Bangladesh served as a flourishing entry port and intermediary in trade and commerce between South Asia and the Far East. The region also played a seminal role in disseminating its beliefs and its arts and architecture in the wider world of Asia. Ancient Bangladesh took great pride as a coveted seat of learning and education and scholars from far away countries regularly flocked to its numerous universities and monasteries.

Etymologically, the word Bangladesh is derived from the cognate Vanga which was first mentioned in Aitarey Aranyaka, a Hindu scripture composed between 500 BC and 500 AD. Literally it means a wetland. Muslim merchants of Arab origin used to refer to it as Bangalah from which its present nomenclature is believed to have gradually evolved.

Geological evidence indicates that much of Bangladesh was formed 1 to 6.5 million years ago during the tertiary era. Human habitation in this region, therefore, is likely to be very old with the evidence of Paleolithic civilization dating back to about 1,00,000 years.

Bangladesh has an area of 1,48,393sq. km and occupies the apex of the arch formed by the Bay of Bengal into which all the rivers flowing through the country drain. Bangladesh has one of the most complex river systems in the world numbering about 230 with their tributaries having a total length of about 24,140 km. The climate of Bangladesh is characterized by high temperature and high humidity, heavy rainfall and marked seasonal variation. Daily temperature ranges from 10*c to12*c in the cool months and in the other months it varies between 28*c and 40*c. Soil of Bangladesh may be divided into three main categories, namely hill soils (Chittagong and Sylhet regions), terrace soils (Barind and Madhupur tracts) and alluvial and flood plain soils.

Bangladesh contains greater biodiversity than that of many countries taken together. Indeed few countries in the world can match its rich and varied flora and fauna which are not only a unique biological phenomenon but are also a great natural resource of the country.

The people of Bangladesh are historically descendants of various races and nationalities. An Austro-Asian race first

inhabited this region followed by Dravidians and Aryans. There was also an influx of the Mongolians from Tibet and Myanmar. The Arab Muslims started coming here in the early ninth century AD.

Persians, Armenians, Turks, Afghans and lastly the Mughals came in quick succession.

As per the census of 1991 Bangladesh has a population of 111.5 million with an average density of 755 people per sq. km. It is the second largest Muslim country. Traditionally a land of communal harmony, followers of other religions enjoy full freedom of worship. The economy is spurt in industrialization with the utilization of the country's available natural resources and manpower. Trade and commerce are increasing and widening. Bangladesh is a repository of rich cultural heritage and tradition.

Long colonial exploitation has largely denuded Bangladesh of its past affluence and wealth. Independence has, however, opened new vistas of prospects and opportunities.In the final analysis, Bangladesh is a land made splendid by natural grace-a veritable mosaic in green, verdant and boisterous, with its dedicated and creative people adding colour and vibrancy to it. (The Bangladesh Diary 1997)

Introduction and background and concept of Empowerment

Bangladesh is a land of some of the poorest people in the world. Half of them are women. For decades, these women were exploited in the name of tradition, culture and religion. Now the time has really come for women to build their own future. Traditionally Bangladeshi women, most of them living in the villages, are conservative. They normally remain inside home, perform the domestic works, care for the

children and elders at home. Most of the rural women help their husbands in agriculture. That is the general practice in Bangladesh. Sometimes they earn money by making small-scale cottage industry products at home. But they do not possess this money.Their husbands generally have the money to spend it at their sweet will.

The status of women in society is determined by many factors. One of the indicators is the level of education in the country. This also helps a country to improve effectively the human resources for national development. But it is a matter of great concern that educational attainment of women of Bangladesh is among the lowest in the world. However, people are not aware of women's role in the society and also in the economy of the extreme poverty of the country. In Bangladesh only one in three school age girls is in school, only 2% of women of age 20-34 are in the Universities, and only three out of a thousand women are in professional jobs (World Bank, 1990.p.59).

Since the independence of Bangladesh in 1971, the women of Bangladesh have been trying to get its own share in the different positions, social, economic and political activities. This endeavor on the part of women and demand of the day helped establish an independent Ministry of Women and Children's Affairs.

The concept of empowerment of women is not a new one. Though the concept is gaining memorandums, the empowerment of women did really exist in ancient India and early years of Islam. The religious scriptures allowed ample opportunity to the women to be considered as true partners of men in development activities. But due to misinterpretation and ulterior motives the women were confined in houses. Now a worldwide realization has emerged recently that without the

active participation of women in all the development activities the ultimate goal will not be achieved.

Empowerment is a process which enables individuals or groups to change balances of power in social, economic and political relations in society. It refers to many different activities including but not confined to awareness of the societal forces which oppress people and to actions which change power relationships. Empowerment redistributes power from the powerful to the powerless. In the Bangladeshi context, empowerment should give the vast majority of women the freedom of choice for self fulfilament and self development as well as equal access to domestic and community resources, opportunities and powers. (UNDP, 1994)

Present status of Women in Bangladesh in social, economic and political context.

Bangladesh is one of the most densely populated countries in the world. Half of them are women. These womenfolk have been following their roles in the forms of mothers, wives, sisters and daughters. They were never seen as partners of development. The status of women in the field of education is given below in the following tables:

Table-1. Gender Disparity in Education

Category	Male	Female
Literacy rate (15+yeras per cent)	45.5	24.2
Per cent enrolled in shcool		
Primary	77.7	61.4
Secondary	32.0	15.0
Post-secondary	12.2	2.3
Per cent dropped out		
Primary	58.3	54.9
Secondary	57.6	65.8
Percentage of teachrs		
Primary	80.0	20.0
Secondary	88.7	11.3
Post-secondary	87.4	12.6
Monthly expenditure on education		
Total Amount (Tara)	25.3	11.4
Per cent	69.0	31.0

Source : BBB ((1993), Women and Men in Bangladesh.Facts and Figures, and UNICEF (1992), Situation Analysis of Children and Women in Bangladesh, 1992.

Table-2. Number of students and teachers by university, 1993-94.

Name of University	Male Students	Female	Total
Dhaka	15,876	6,988	22,864
Rajshahi	10,559	3,246	13,805
Chittagong	6,155	1,908	8,063
Jahangirnagar	3,002	917	3,919
Engineering	4,439	607	5,046
Agricultural	3,191	281	3,472
Islami	2,865	309	3,174
Shahjalal	874	105	979
Khulna	437	74	511
Open	42,401	13,125	55,526
Total	89,799	27,560	1,17,359

Teachers

Dhaka	900	289	1,189
Rajshahi	556	61	617
Chittagong	405	44	449
Jahangirnagar	240	47	287
Engineering	389	25	414
Agricultural	381	15	396
Islami	88	4	92
Shahjalal	61	12	73
Khulna	41	2	43
Open	34	8	42
Total	3,095	507	3,602

Source : (1) University Grants Commission.

Table-3. Number of teacher's training colleges and institutions and number of students therein.

	Teachers Training College (Secondary School Studetns)				Teacher Training Institute (Primary School Studetns)			
	College	Male	Female	Total	Insti tutions	Male	Female	Total
1985-86	10	2,550	950	3,500	51	6,453	1,850	8,303
1986-87	10	2,615	1,009	3,624	53	4,675	3,725	8,400
1987-88	10	2,584	1,040	3,624	53	-.	-	6,893
1988-89	10	2,379	1,328	3,707	53	3,286	4,439	7,725
1989-90	10	2,444	1,342	3,786	53	3,144	2,417	5,561
1990-91	10	2,444	1,342	3,786	54	NA	NA	5,010
1991-92	10	2,983	1,469	4,452	54	2,662	2,348	5,010
1992-93	10	2,983	1,469	4,452	54	2,662	2.348	5,010
1993-94 (P)	10	3,271	1,458	4,729	54	1,595	1.700	3,295

Source : 1. BANBEIS
2. Bangladesh Economic Survey, Ministry of Finance.

Table-4. Nmuber of teachers and students in different institutes under the University of Dhaka 1992-93

Institute	Number of Teachers			Number of Students		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Institute of Social Welfare and Research	10	8	18	404	221	625
Institute of Statistical Research and Trainning	11	4	15	259	21	280
Institute of Modern Languages	22	4	36	469	29	498
Institute of Business Administration	32	4	36	469	29	498
Institute of Education and Research	22	16	38	384	164	548
Institute of Nutrition Science and Food	26	10	36	28	24	52
Institute of Fine Arst	31	7	38	387	235	622
Dip-in-L.Sc. and M. phil, Ph. D	10	2	12	220	157	377
Total	164	64	228	3,326	1,195	4,431

Source : Registar, University of Dhaka.

Table-5. Nmuber of Teachers, Studetns of Government Colleges in Bangladesh

No. of Schools					No. of Teachers				No.of Students (000)			
Year	Boys	Girls	Total	% Varition	Male	Female	Total	% varition	Boys	Girls	Total	% varition
1985	43248	340	43588	1.4	159852	23786	183638	0.4	6002	4080	10082	4.4
1986	43417	295	43712	0.2	159317	25351	184668	0.4	6201	4575	10776	6.8
1987	43665	327	43992	0.6	158186	30183	188369	2.0	6378	4885	11263	4.5
1988	43831	371	44202	0.5	156484	32707	189191	0.4	6729	5026	11755	4.4
1989	45049	290	45339	2.5	157513	35303	192826	1.9	6597	5177	11774	0.2
1990	45480	303	45783	0.9	160183	39873	200056	3.7	6912	5433	12345	4.9
1991	47561	585	48146	4.9	161429	41418	202847	1.4	7111	5924	13035	5.3
1992	49483	481	49964	3.6	163641	44631	208271	2.6	7472	6245	13717	5.6
1993	47214	3684	50898	1.8	166230	48.549	214779	3.3	7581	6621	14202	3.4

Source : (i) Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS). (1971 to 1977).
(ii) Primary Education Officer, M/O. Education

Women in Development and politics.

Over the last two decades, a world-wide sensitivity to the problems of women has developed. The feminists of both the North and the South, in spite of differences among themselves, have been very vocal about the genuine rights and shares in development for their sisters everywhere in the world.

Regarding the operational strategies, Bangladesh is in a better position than Tanzania. The last five year plan (1990-95) proposed eleven major strategies to achieve the objective of bringing women in the mainstream of development. However, it is to be noted that the women's movement has identified three key bars to achieving gender equality, namely gender inequality in unpaid reproductive labour, in entitlement to factors of production and in decision-making.

In the last two decades, women's organizations have proliferated and people have been made more aware of gender inequality through research and public debate. Mahila Parishad, Ain Shalish Kendra, Women for women, Nari Paksha, Ubinig, Nijeria Kori, Saptagram-all these women's groups and organizations have been trying to establish close links between women researchers and activists in order to enhance the women's voice and agenda. But the limitation of the process is that the non-government women's groups are still largely urban based advocacy groups with few rural links. Bangladesh is a unique case in terms of women's leadership in politics-both the Prime Minister and the leader of the opposition are women. There are three women in the present cabinet of ministers. But has the women's lot significantly changed in the country with women's increased role in politics? Perhaps we have to wait for a positive answer in this respect.

Indeed women have come a long way in having there due shares in the decision-making process. There are 30 seats reserved as the female quota in the national parliament. Three female members in each union parishad-the lowest tier of local government-were directly elected in the last union parishd elections held in December, 1997 defying the fatwa of the fundamentalists. These fundamentalists try to misinterpret Islam to their petty and mean advantage and hardly anyone dares contradict them especially in the rural areas. But the fundamentalists have failed to browbeat women into silence this time. The enthusiasm shown by the female voters in the recently held union parishad elections has encouraged the government to allot reserved seats in the corporations/ municipalities for women and there will be direct elections for these seats. These two events will surely induce the women's groups to come forward with reforms in electoral rules to accommodate more women elected bodies. However, the women's quota in the national parliament is criticized by feminists as it deters the nurturing of a political constituency for women.

Table-6 : No of Female Ministers at Different Times

Regime	Total No. of Ministers	Lady Minister/ State Minister/ Deputy	%
Awami League Government (1972-75)	59	02	04%
Goernment of Bangladesh Nationalist Party (1977-1982)	101	06	06%
Bangladesh Jatiya Party (1982-1990)	133	04	03%
Governtment of Bangladesh National Party (1991-1996)	39	03	05%
Awami League Govt.(1996)	24	04	16%

Source : Cabinet Division 1997

The table-6 shows a clear rising picture of empowerment of female politicians during the current political regime.

Women in Administration

There was no female officer in administrative cadre before 1983. There were a few female officers in Audit and Accounts, Education cadres. Some of them worked as doctors, teachers and gradually, the women are coming to all the 28 cadres of Bangladesh civil service. The following table shows the status of women in public administration :

Table-7 : Women in Higher Public Administation

Post	Male	Female	Total	%
Secretary	50	01	51	2%
Addl. Secretary	79	02	81	2.5%
Joint Secretary	247	07	254	2.8%
Deputy Secretary	474	14	488	2.9%

Source : Organization and Management Wing, Ministry of Establishment, 1996.

Review of the existing policies and programmes of both Government and NGO

Gender Question :

In recent years, questions centering around gender equality have become important and demand to be answered expeditiously. Women comprise 48 per cent of the population of the country. Of this, 86 per cent live in rural areas. The average age of women at marriages is less than 18 years; on average a woman produces four children in her life time. Social norm against remarriage of widows coupled with an average age

gap of 10 years between men and women in wedlock result in 90 per cent of widowed population being females. Likewise, women comprise 94 per cent of the divorced population of which 54 per cent are below 24 years of age. As of now, participation of females in labour force amounts to over 20 per cent of all households of the country are functionally female headed. Constitutionally, women in Bangladesh have equal rights with men in all spheres of the state and of public life; they cannot be discriminated against or subjected to any disability or restriction with regard to access to any place of public entertainment or resort or admission to any educational institution on ground of being women.; they are entitled to special provisions in their favour to be made by the state (article 28); they cannot be discriminated against in respect of any employment or office of the state (article-29). In addition to these fundamental rights, prevention of prostitution (article-18) and ensuring participation of women in national life (article-10) are constitutionally accepted as two fundamental principles of state policy. Further, guaranteeing of fundamental human rights and freedom and respect for the dignity and worth of the human person is adopted as a principle fundamental to the governance of the country (article-11).

Situation Considerations : Despite these constitutional rights and entitlements, women across both classes and religions, have quite a scope to improve upon their status and condition in terms of equality with men. If progress in this respect is not made or slowed down, conflict breeding out of gender inequality as already observed, will increase in intensity with fuelling from the borderless information media and fast changing economic circumstances. Specific to the conduits for making progress are the following considerations:

a. Women's lives are organized, (particularly in rural areas) within a framework of biological, labour and social reproduction of a society in which management of female sexuality is central to the dominant male interest; in this frame high value is attributed to female sexuality; this makes females acutely insecure, requiring a cultural norm of isolation and protection to avoid possible female violation; in this cultural norm, a violated female irrespective of causes or manner of violation, is treated as a female fallen from virtue and left to earn her livelihood in any way she can in this process, resort to the oldest profession or prostitution by her is acceptable without its being much stigmatic on male customers and patrons.

b. Under changing economic conditions, the aforesaid cultural norm breaks down, a continuous deviancy from the acquired cultural norm about womanhood starts to win over degradation of women as human persons; to accentuate such a break-down, dynamics of those who break the norm, those who tolerate the breaking and those who uphold the norm need to be assessed and understood; as is perceived such a breaking down has its class dimension; for the poor material or economic circumstances may make men encourage women to break the norm and come out of chains of isolation and protection.

c. As women come out of isolation, veils and chains into a working and pulsating lives, they are likely to confront the 'double day' and consequently even 'double exploitation' through the interplay of gender and class relations; the prevailing gender relations do not usually release them from the primary responsibility for homestead chores even when and after they enter the formal work place or the job market. Thus an extension of female

participation in male dominated workworld needs to be accompanied by changes in traditional codes of household duties enjoining amongst others, cooking of meals and rearing children on females alone.

d. Evidently, there is male bias in the set of family laws in force: women across both classes and religions have to struggle over their (i) inheritance rights in natal family; (ii) rights to choose husbands; (iii) sexuality and pregnancies in marriage; (iv) rights to the dowry which usually accompanies her at marriage; (v) property right in the event of husbands' death; (vi) right over property and to subsistence in the event of divorce or desertion; (vii) custody right over children, their subsistence and education; and (viii) procedure of separation and divorce. The laws relating to nationality in marriage, equality of pay, maternity leave, protection against sexual harassment at work places, etc., are either absent or unendorsed.

e. Equality apart, research across countries in recent years shows that female education has marked negative relation with fertility and infant mortality and strong positive relation with life expectancy; likewise schooling is found to have important influence on choice of number and quality of children; these are effects that influence long term growth of a society. Specific to Bangladesh, equality of women with men is likely to have positive effects on poverty alleviation. The female headed households constituting over 20 per cent of all rural households are about the poorest reflecting widowhood, divorce and abandonment, all virtually uncared for by the society.

Policy Measures : These five considerations point out as many mutually reinforcive policy measures fraught with elements of social and economic conflicts:

a. Breaking the cultural norm centred round high valuation and consequent protection of female sexuality; this is likely to create and even intensify conflict with the fundamentalists and uneducated male chauvinists; widespread liberal arts education, female literacy and collective effort by conscious and educated women to break the traditional gender code are likely to limit such conflict down to its ultimate winning over by the forces favoring gender equality;

b. Providing women access to power through access to material resources : to this end some definite ways are : (i) credit support following the principles developed by the Grameen Bank and some NGOs working in the field; (ii) adopting a system or norm for joint registration of properties by married couples during marriage; (iii) reform towards equitable inheritance law; (iv) affirmative female employment policy; and (v) election of women members of the parliament and local government bodies (against seats reserved for women) by universal adult franchise of the relevant constituencies;

c. Changing the traditional gender code of division of duties of males and females; this can be done through education, orientation and consciencetisation; NGOs working in the field have already shown ways following which an initial and widespread break-through can be made; public debates, open dialogues and affirmative actions by women organizations are likely to have positive effects; opening up all modes of employment in the government and parastatals to women is likely to provide the needed pilotage in this regard;

d. Making appropriate reforms in laws relating to family, inheritance, parental responsibility, work place equality

and nationality in marriage: these have to be taken up by the parliament in conformity with the constitutional provisions and mandates; and

e. Extending education and health facilities with an effective and affirmative bias towards women: to this end, the recently adopeted subventions and supports to female education in secondary schools and physically extended health care and family planning facilities are steps in the right direction; these steps need to be strengthened through curricular reform and improvement of the health and related service delivery system.

Recommendations and Suggestions :

So far we have discussed and brought out meaningful insights into the position of women in our society. But the item has really come when words should be translated into positive deeds. Karl Marx's oft-quoted remark would bear repetition in this contest : 'Philosophers have so far interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it'. We can improve the condition of women only when we can coordinate the sincere efforts made by all the actors-government, civil society and NGOs and the donors and when the forces of change can establish their hegemony. It would perhaps help to clarify our vision if we can deal more elaborately with the forces of change shaping up within the civil society. Finally, it is also worth remembering that without the close cooperation and participation of women in the process of social production and their consequent empowerment, we can not have national development in the true sense of the term.

For effective Empowerment of Women the following measures should be taken by the different agencies including the Government.

Actions in advocacy :

a. Political commitment for the achievement of gender equality and women's empowerment in all spheres of life by the year 2010. This should be reflected in the constitutions and manifestos of major political parties and by a Government statement of intent.

b. Advocacy for sharing housework between male and female members of the family and to change the attitudes of husbands, parents, in-law and community.

Actions for Government :

a. assessment of capacity, impact and cost-effectiveness of MWS and WID focal points in Line Ministries.

b. electoral reforms to ensure women's direct election to the national parliament and at all levels of local government.

c. legal reforms to give wives rights over joint property during marriage.

d. specific programmes to give land title to single landless women.

e. implementation of the ILO conventions on labour laws for the protection of female industrial workers.

Actions for other organizations :

a. inclusion of gender issues in the party manifestos.

b. providing different role models of women in redesigned curricula and through counsebing, specially for adolescent girls.

UNDP, 1994.)

Conclusion :

We require both our hands to pray to our Creator. So the active cooperation between the men and women is a must for real development for a developing country like Bangladesh.

Bibliography

Ahmad Nulufar (1991a). "Women in Development in Bangladesh : Role of Donors and Non-Governmental Organizations", Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 11, No. 1, Dhaka.

Ahmad Q. K. et al (1985), UN Decade for Women 1976-1985 : Situation of Women in Bangladesh, Ministry of Social Welfare and Women's Affairs/GOB.

Alam, Bilquis Ara (1985), Women's Participation in Local Government in Bangladesh, Centre for Women and Development, Dhaka.

Bangladesh Bureau of Statistics (1992), Labour Force Survey 1989, Government of Bangladesh, Dhaka.

......(1989), Women and Development in Bangladesh : Challenges and Opportunities, Ford Foundation, Dhaka.

......(1995), The Elusive Agenda : Mainstreaming Women in Development, The University Press Limited (Bangladesh Edition), Dhaka.

......(1997)...Statistical Yearbook of Bangladesh, 1996, Government of Bangladesh, Dhaka.

......(1998), Statistical Pocketbook of Bangladesh, 1997, Government of Bangladesh, Dhaka.

Jahan, Rounak (1977), "Public policies, Women and Development" in Jahan, R and Papanek H (ed.) Women and Development : Perspective from South Asia BILIA, Dhaka.

The Constitution of the People's Republic of Bangladesh (As modified up to 10th October, 1991). GOB

The Fifth Five Year plan, 1997-2002, 1998. Planning Commission, 1998, Government of the people's Republic of Bangladesh, Dhaka.

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol.13, June 1999, Ashar 1406

Women in Development in Global Perspective

Ayesha Azim *

Development according to MahatmaGhandi "recognition of human potentials" which includes both man and women". Participation is considered as a precondition for development". Development thinker Gutierer considers "development as liberation from oppression forces," It means development cannot be achieved without liberating each and every individual from all forms of subordination." The full and complete development of a country, the welfare of the world and all causes of peace, require the maximum participation of women on equal terms in all fields. In World's male dominated society, women's position is far worse than their male counterparts because of the socio-economic situation & cultural tradition.

"Women suffer dual oppression of sex and class within and out side family". The effects are strikingly apparent in the present world's population. "They perform nearly two thirds of all working hours, receive only one tenth of world's income and own less than 1% of the world's property (Women Welfare Conference, poster : 1985, Nairobi).

* Dircetor, BPATC

Background of Women in Development

Recent years in the world history, the role of women in development process has become central focus. Naturally women have triple role in society as "reproducers, producers and community managers". The way women's role as wives, mothers have been recognized throughout times, their role as farmers, community leaders, educators of young people and protectors of the old people has been ignored and has a general tendency to overlook. This discrimination against woman is profound and it is a sort of sickness which is deep in the subconscious mind of both men and women. Besides the structure of the society and status of women in it is also to be held responsible for such negligence to women. As per Vickie Randell Paul Den "backwardness of women in our society is due to the effect of their childhood socialization". That is a female child from her childhood recognizes the prominence of her father or brother in the family and she grows up accepting their prominance. Secondly, motherhood, in the form of rearing up the children and looking after home has made women less progressed than male members of home. Thirdly, in the structure of home or society there exists hardly any position or status of women where they can fight for their own right i.e. they lack of own organisational power/position at home. These factors have made one of the hardest sources of inequality to fight. Analysis of women's situation, therefore shows today's women's inferior status is starting to be seen not as something right and natural but as the result of systematic discrimination on the basis of sex. So the scales of world's equality are out of balance. Women is weighted down with responsibility while man goes up high with power day by day. So as per the above views women must do all the domestic work and man possesses almost all of the world's wealth.

While speaking of women's participation out side home in a true sense, it actually started in U. S. A. in 1840's, U. K. in 1850's, Germany and France 1860's. In U. S. A. in 1814 only 5% women used to work outside home. On 8th March in 1857 women workers of Needle Producting Factory of New York City protested against the inhuman treatment to them. They have raised their voice against unequal pay, unequal treatment, hazardous environment and long hour works i. e. (12 hours per day). In 1860 on 8th March all those women workers got together, formed unions and protested for their rights. This procession was blocked by police who attacked them. This has made the protestors more united and stronger who committed to release their rights. On the same day of 8th March in 1910 CLARA ZETKIN a Gagman women leader called the world community to observe the 8th March as an WOMEN'S DAY. While later on 1984 United Nations has declared 8th March as INTERNATIONAL WOMEN'S DAY. The purpose of UN designates 8th March as international women's day is to review and appraise the implementation of women's rights. Accordingly 8th March is the global celebration that symbolizes the progress made in the areas of concern for upholding women's rights and to publicize the obstacles and discrimination that women are to go through.

Discrimination against women existed in Europe, France and in other European countries too. In France women used to get 13 french shush (money) while men used to get 30 french shush (money) for doing the same jobs. French thinkers like ALFRED, DUMAS & SAND protested for such inequality and they supported women's cause for development. In 1948 Ellen Roosevelt wife of Theodore Roosevelt (Ex-President of U. S. A.) declared that, "in the Family of human beings all members have equal rights". She meant that men

and women both have the similar rights in the family. In 1950-1960 different scholars, researchers and philosophers like RUSKI, RAYON, JOHN STUART MILL supported women's cause for development. From 1961 development of women was an international issue and a matter of discussion, which started globaly. Inspite of all these efforts upto 1971, integration of women in development was in marginal and secondary level.

Since its birth the United Nations (after the World War II), is emphasizing to establish equality between men and women has been a fundamental text of the U. N. charter. By 1945 the charter affirmed its faith in fundamental human rights in dignity, worth of human persons and in the rights of men and women. Two years later i.e. in 1947 a U. N. Commission on status of women was established.

Emergence of Women in Development

After the Second World War many countries became independent and as such they were thinking to develop their women folk socially, politically and economically. On this context women's development was an issue at their national levels. It was also observed that from 1960 all sorts of social movements started gradually.

In 1970 Easter Bosraf's book on "Women's role in Economic Development" influenced very much policy makers of the world. This book has been called the fundamental text for UN for women's development. Slowly a consciousness started to develop to integrate women into development.

In 1972 UN has decided through its resolution no 3010 to declare 1975 as women's year.

The World's Food Conference in 1974 found that 40% women of the world are the main food producers, 80% women of

African Country were the main food producers and 50% women of developing countries are involved in food production works.

World Population Conference also proved that women's status development has positive link with the decrease of fertility.

GNP does not act as real indicator of development.

The above factors were the causes of emergence of WID concept.

Global Process on Women's Development

Besides the above facts, a wave of democracy and participation has swept over the world. In the background of these changes, United Nations Organization focused upon the action plan for women's development. So the year 1975 was declared as the International Year of Women which was the First World Conference on Women. The continued fighting on inequality led to the declaration on 1975 as International Women's Year marked by a World Conference in Mexico City which was attended by delegates from 133 countries. The same year the U. N. General Assembly declared that the ten years between 1975-1985 to be the U. N. World's Decade for women. The Themes of the conference were- equality, development and peace. And five years later in 1980, a second conference was held in Copenhagen to maintain the momentum of the decade and for report on progress made so far in improving the position of women. At this conference 1,326 delegates from 145 countries attended to hear the preliminary results of research conducted during the Decade. In this conference, the importance of the participation of women in the development process, both as agents and beneficiaries was stressed. At that time at the end of the year, there were

some signs that Govts have begun to take care of their women. In 90% of the country's Govt. bodies decided for the advancement of women, 50% of these have been established since beginning of the decade. This conference reviewed and evaluated future strategies to reach Nairobi Forward Looking Strategies (NFLS). In the meantime on December 18th, 1979, the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) was adopted by UN General Assembly. CEDAW was adopted as an international bill on the rights of women and which contains Articles on basic human rights. 135 countries are member of this. (And the president of CEDAW is a Bangladeshi woman). Bangladesh ratified the convention in November 1984 with some reservations on the basic articles and articles about personal law. CEDAW contains in total 30 articles which is cited below.

Article 1-16 on the Equality between men and women

Article 17-22 on operation and responsibilities of CEDAW.

Article 23-30 on Administration of CEDAW.

The major provisions of CEDAW are as follows :

1. Elimination of all forms of discrimination against women.
2. Equality in national constitution and legislation and their implementation.
3. New legislation to ensure equal human rights to women.
4. Protection of maternity.
5. Elimination of social prejudice and equal recognition of the roles and responsibilities of women.
6. Legislation and ensuring implementation to stop trafficking of women.
7. Elimination of discrimination of women in politics and public life.

8. Equal opportunity for women to represent them in government and at international level.
9. Equal rights to acquire nationality.
10. Equal right of women in the field of education, culture etc.
11. Equal employment and training opportunities for women.
12. Elimination of discrimination against women in the field of health care.
13. Equal rights in areas of economic and social life including recreation.
14. Particular problems faced by rural women in terms of access to resources and services.
15. Women to be equal with men before the law.
16. Eliminate discrimination against women in matters relating to marriages, custody of children, property (interest of children to be paramount).

Decade of Women

Until the early 1970s "women as a distinctive rather than residual category made its appearance in development thinking". Besides, there existed social movements, and economic growth which was accompanied with the increase in unemployment and poverty that was effecting the growing concern with basic needs and poverty alleviation. So U. N. Decade for women tried to redistribute the wealth, work, the power and responsibility more fairly between men and women.

The emergence of women as a category of development from international perspective started through out the decades of 1960s, 1970s and finally from 1980s where women have been taken as a category of development. 1976-1985 was concentrated on women development throughout the world.

As the theme of the Decade of the women was Development, Peace and Equality and the sub-theme was Emloyemnt, Education and Health for women of the world. The Second World Conference was held in Copenhagen, Denmark of finding out as well as to sort out the courses of action of the second half of the UN Decade for women. The Third World Conference on women held in 1985 in Nairobi, Kenya adopted the Nairobi Forward Looking Strategies (NFLS) for the advancement of women through Development, Peace and Equality. The Nairobi conference strategies were adopted to review the decade of women. The Action plan of this conference reflects the shift from welfare to equity or Fair approach. The following are the details on policy approaches developed for women:

Policy Approaches to Develop Women

Gradually on Third decade i.e. from 1980s there were different policy approaches developed (advocated by Buvinic 1993). As it was found that there was no explicit policy approaches for women, who were benefited from the role of women and are expected to gain from the projects and programs. In that sense policy approaches to women have changed "mirroring shifts in macro-economic development approaches broadly modernization, basic needs and structural adjustment". Emergence of WID concept attacked the first welfare approach which focuses on women's role as wives and mothers which offering household works supporting man, whereas "men are here seen as the main target for development and they are the main work force". And women are the beneficiaries in development through their men. Women this way is not active participants to development. So it was found rather women are under-utilized.

Next Equity/Fair approach. This approach seeks to improve women's status, power and control so that women are more

equal with men. This approaches recognize" women's active role in development particularly through their productive role. It also seeks to challenge the power of men over women and to end discrimination."

The third approach is "anti poverty approach". This approaches focuses on women's problems as they are the "poorest of the poor". The solution of poverty alleviation, are not in equality with men. This approach thus is concerned and aims to increase women's earning capacity through generating projects, skill training, introduction of appropriate technology and literacy.

According to Mouser (1989) who advocated development of women through two more important approaches as Efficiency and Empowerment approaches. Through Efficiency approach it is seen that women are "essentially not as beneficiaries of intervention, but as a major resource of development. Being the half the world's population they one already contributing to all economies but they are not sufficiently used""So to make of development efficient, it has to include the participation of women who has the capacity to "compensate for declining social services" by the use of their free time. It needs women to put into main streams of development. As they are under utilized, their participation is a "must".

Next is Empowrment approach comes from women's groups who find to empower themselves through greater self-reliance. They seek to influence own changes and the rights to determine their own choice of life. They also seek to gain control of and access of resources. This approach emerges from women who have been involved in liberation struggles and grassroots women's organisations. These approaches brought a great change for women's improvement.

Due to the above approaches changes and emergence of new consciousness some changes came in the organisational structure of UN's body. So by the end of 1980s there were several organisations created in UN system which are as follows :

_ Creation of Women Division

_ UNDP for women

_ The legal status of CEDAW

_ International Research and Training Institute for Women (IRTIW).

In view of above and on the basis of NFLS the Fourth World Conference on women was held on 30th August to 15th September 1995 in Beijing to evaluate the implementation status of the Nairobi Forward-Looking Strategies for the advancement of women and to adopt a platform of action for Third UN Decade 1995-2005.

The "platform of action" is an agenda for women's improvement. It aims at accelerating the implementation of the Nairobi Forward Looking Strategies (NFLS) for advancement of women and at removing all the obstacles to women's active participation in all spheres of public and private life through full and equal share in economic, social, cultural and matter of human rights. It is a condition for social justice and is also an essential fundamental pre-requisite for equality, development and peace. The Beijing conference were on the progress and drawbacks on the implementation of NFLS as to how the women have been involved in areas like the health, education, employment, family life and human rights. This conference also sought ways to eliminate gender discrimination and develop new partnership between men and women in the 21st Century.

Hence looking back to the history of advancement of women, we find the following development since 1945 until now.

1945	UN charter on human rights Sub-Commission on the status of women.
1946	Commission formed on status of women
1966	CSW Submits a Draft Declaration.
1975	- International women's' year - World conference on Women - New women's organisation & projects for women
1976	- UNFEM - Declaration of Women's decade
1976-1985	UN Decade for Women
1978	INSTRAW Temporarily
1979	Adoption of CEDAW
1980	MID-Decade world conference on Women in Copenhagan
1985	End of Decade world conference Nairobi Forward Looking strategies (NFLS)
1990	World Summit for child
1992	Earth Summit Development in "Women and Environment (Rio conference)
1993	World conference on Human Rights. (Vienna declaration)
1994	International Conference on Population Development (ICPD), in Cairo.
1995	Fourth World conference and NGO Forum Beijing. (to review the implementation status of (NFLS), Beijing Declaration and UN Platform of Action).
1996-2000	Medium term plan for Women and Development is being prepared which will ensure that the process for implementation of NFLS within UN system is to secure beyond the deadline of 2000.

Conclusion :

Twenty first century is ushering in an era of new hopes and aspirations for the women-folk, as the women of the world can now look forward with pride and hope for having some outstanding and significant movements that have taken place in the last two decades for their all out development. In this period,the drive for women's rights has accelerated and taken on global momentum. In the 23 years since the first UN conference on women, the campaign for equality between women and men has witnessed momentous changes and remarkable advances in the world's history.

References

Charter Ellen, Women in Third World Development, Page-35

Gender perspective in Development policy Vanessa Grifith (APDC), Kualalumpur.

GOB and UNICEF, Selected Statistical Series, Dhaka. January, 1992

Huda, Sigma, UN Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and Bangladeshi Laws.

Islam Shamim & Begum Zakia, Victim of Violence, Dhaka.

Mainstreaming women in the Fourth Five Year Plan : a suggestive approach Women for women 1989, page-8.

Sobhan, Rehanman, Planning and public Action for Asian Women, University Press Limited, Dhaka, 1992.

The World Bank, Strategy paper on Women in Development 1990. Washington D. C.

The World Bank and Family Care International 1990.

UN, Convention onthe Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Todaro, Michael, P. Economic Development of the Third World.. Fourth Edition, Long man Group, U. K., Limited 1989.

UNICEF, The Progress of Nations, 1993.

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol.13. June 1999. Ashar 1406

Hill Tracts Peace Accord : An Analysis

Kazi Mohammad Shamsul Alam *

Introduction

The Chittagong Hill Tracts region covers a total area of 13,181 square kilometers (5,089 square milers) and divided into three administrative districts: Rangamati, Khagrachhari, and Bandarban. In 1991, population was 9,74,445. Out of the total Population, 5,01,144 are tribals and the rest are plainsmen.[1] The Tracts are inhabited by 13 tribes, each speaking its own distinct dialect. The tribes can be broadly classified into two groups: (1) the ancient tribes, which are Kuki, Kumi, Mro, Lushai, Khyang, Banjogi and Panko; (b) the domiciled tribes are Chakma, Marma, Tripura, Tangchangya and Riang. The three principal tribes of the region are Chakma, Marma and Tripura.

Historical Background

To understand the problem of the Chittagong Hill Tracts, one must look into its past and its geographic location. The Tracts belong to the hilly region that branches off the Himalayan ranges to the south through Assam and Tripura to Arakan and Burma. As a result, the historical development of the Hill

* Deputy Director, BPATC

1 Statistical Pocket Book of Bangladesh 1997

Tracts had been different from the rest of Bangladesh, which is a low-lying alluvial plain.

Since ancient time, Chittagong Hill Tracts and Chittagong region was a bone of contention between the kings of Tripura and Arakan. It frequently Changed hands. According to one account, Bira Raja, the founder of the Tripura Royal Dynasty defeated the king of Chittagong Hill Tracts in 590 A. D.and made Rangamati his capital. In 953 A. D. Tsula Tsandra, king of Arakan occupied the districts of Chittagong Hill Tracts and Chittagong. Then in 1240 A. D., the King of Tripura occupied this region again. Sultan Fakhruddin Mubarak Shah (1338-49) of Bengal conquered Chittagong and possibly parts of Hill tracts. During the reign of Sultan Shamsuddin Ahmad Shah (1431-42) the region was again lost to the Arakanese king. Sultan Rukunuddin Barbak Shah (1459-74) re-conquered the region. During the reign of Alauddin Hussain Shah, Arakanese King occupied the region for a short period. Alauddin Hossain Shah (1493-1519) recovered the territory and appointed Paragal Khan as it's governor. Between1515 A. D. to 1531 A. D, there was contest between the rulers of Arakan and Tripura for the possession of the area. During his campaign in Bengal, Sher Shah occupied this region. There after, King Bijoy Manikya (1540-71) of Tripura conquered the territory. The Arakanese King took control of the area from the Tripura ruler in 1575 A. D. The district of Chittagong Hill Tracts remained in Arakanese possession till 1666 A. D. Shaista Khan, the governor of Bengal, under Emperor Aurangzeb conquered the district from the Arakanese king in 1666. The area remained undisturbed in Mughal possession until 1760, when it was ceded to the East India Company by Mir Qasim, Nawab of Bengal. In the beginning, the East India Company did not interfere in the internal affairs of the Hill Tracts and remained happy with the annual tribute received

form the Chakma Chief. But in 1777 A. D., Chakma Chief Sherdoulat Khan refused to pay the annual tribute. Two expeditions sent against him by the Company were unsuccessful. His son and successor Janbux Khan made peace with the company by agreeing to pay an annual tribute of 500 maunds of cotton. During the chiefship of Rani kalindi, British interference in the affairs of the Hill Tracts gradually increased. There are two other Chiefs in the Chittagong Hill Tracts. One is Bohmong Chief, based in Bandarban and the other is Mong Chief based in Manikchari. Ancestors of the Bohmong Chief were in this area, since the Arakanese rule. In the first half of the nineteenth century, the then Bohmong Chief, Sathanfru made a settlement with the East India Company agreeing to pay Rs. 4,600 annually as revenue. Ancestors of the Mong chief arrived in this area from Arakan after Burmese conquest of the Arakanese kingdom. In 1882, British rulers created the Mong circle comprising the present khagrachari district and recognized the head of the immigrants from palong Khyong in Arakan as chief.In 1860, the Hill Tracts were separated from Chittagong and a new district of Chittagong Hill Tracts was created. An officer, with the designation of Superintendent, was given the charge of the district. In 1900, the Chittagong Hil Tracts Regulation I was promulgated. Under the Regulation, a set of rules for the administration of the Hill Tracts was published. Chittagong Hill Tracts was retained as exclusive responsibility of the governor assisted by the Executive Council as an excluded area. Before 1860 and to a lesser extĕnt afterwards, the internal administration of the area was in the hands of two tribal Chiefs. Later on, Mong Chief joined them to share the burden of administration.

As the partitioning of the Subcontinent became imminent, the tribals, especially the Chakma elite, were caught in a

confused situation. While some of them were in favor of inclusion into Pakistan, a more prominent section amongst them, was in favour of union with India; their reason being the non-muslim demographic character of CHT. It is reported that Kamini Mohan Dewan and Sneha Kumar Chakma even made overtures to such Congress high-ups as Mahatma Gandhi, Acharya Kripalini, Rajendar Prasad, Shyama Prasad Mukherjee and Sardar Ballav Bhai Patel. These congress leaders are on record as having sympathized with such a demand of the CHT tribal population, and a Congress delegation was also sent to Rangamati to make an on-the-spot appraisal of the situation. But as things turned out, union of CHT with India became an impossibility. Therefore, in 1946, the tribal chiefs formed "The Hill Men Association", and proposed a princely state status for CHT at par with neighboring Tripura, Koochbihar and Khasia; and with which they also proposed a confederation to be under the administrative control of the central government of India. But this move also failed; and by 16 August, CHT became a part of Pakistan. But before this could happen, Sneha Kumar Chakma, in desperation, had hoisted the Indian flag in Rangamati on 14 August. At the same time, the Marmas, who claimed descent from the same stock of people as those inhabiting Myanmar (Burma), had hoisted the Burmese flag at Bandarban. In considering the present political agitation and armed insurgency in the area, this factor of accession to Pakistan needs to be taken into consideration.[2]

After the establishment of Pakistan, the government banned Jana Samity, the only tribal political organization in the

2 Shelly, M. R. (ed.), The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh : The Untold Story, Centre For Development Research, Bangladesh, Dhaka, 1992, p.29.

district. Government also repealed the Chittagong Hill tracts Frontier Police Regulation 1881 and absorbed the local police force into the East Pakistan Police. Immediately after partition, a large number of refugees from India were rehabilitated in the Hill tracts. In the constitution of 1962, the administrative status of Chittagong Hill Tracts was changed from "Excluded Area" to that of "Tribal Area". All these steps were not welcome to the tribal people. They considered them as steps to destroy their separate identity. Although, Regulation 1 of 1900 was operative and tribal people continued to enjoy the privileges under the Regulation. In 1965, High Court declared Rule 51 of Regulation 1900 as Ultra-vires of the constitution. As a result, the Deputy Commissioner could not expel any non-political person from the Hill Tracts. Moreover, Rule 34 of the Regulation was amended which gave non-tribal people residing in the area continuously for fifteen years, property rights. This was considered by the tribal people as a blow to their rights.

Development measures undertaken by the government also harmed tribal interests. The Karnafuly multi-purpose project was completed in 1963. The lake created by the project submerged an area of 400 square miles. The submerged area included 54,000 acres of cultivable land. About hundred thousand tribal people were affected. Rehabilitation measures undertaken by the government were not sufficient to cope with the problem. As a result, a large number of tribal people left for India. At the same time, education spread among the tribal people. This resulted in the development of political consciousness among them. Naturally, several attempts for forming political organizations were made. One such significant attempt lead to the establishment of Rangamati Communist Party On 16 May, 1970, RCP was

launched by Manabendra Narayan Larma, his younger brother Jotindriya Bodhipriya Larma and two other student leaders. In 1970 general election, M. N. Larma and A. S. Pure Chowdhury were elected member of the Provincial Assembly. Tridiv Roy, the Chakma Chief was elected member of the National Assembly.

When the War of Liberation started in 1971, the tribal population could not take a clear decision as to the side they would choose. Some individuals like Charu Bikash Chakma, K. K. Roy and Mong Prue Chai Chowdhury joined liberation forces. Chakma Chief and Bohmong Chief supported Pakistan. M. N. Larma remained neutral. Chakma Chief Tridiv Roy had been a member of the Pakistan delegation to the United Nations. The delegation was engaged in anti-Bangladesh Propaganda.

The role of Tridiv Roy and that of some youths in the Civil Armed Forces gave some of the freedom-fighters of Bangladesh enough reason to label sections of tribal society as anti-liberation element. Consequently, even during the liberation war, the tribal habitations of some villages of Matiranga were reportedly torched by the freedom fighters. As the liberation war drew to a close by December 1971, it was alleged that excesses were committed by the freedom fighters at Panchhari and Dighinala. In the wake of such allegations, the tribal members of the Civil Armed Forces, who had fled to deep forests immediately after the surrender of Pakistan Army, gradually reappeared and regrouped to become the nucleus of the tribal armed organization *Shanti Bahini*, which would emerge in a couple of years time.

Thus at independence Bangladesh inherited a tribal problem that had a long historical genesis and to which greedy action

of some of the tribals and emotionally charged reaction of some of the freedom fighters added further complexity.[3]

In these circumstances, a tribal delegation led by Charu Bikash Chakma, a prominent Awami League leader, met top government leaders and demanded constitutional safeguard for the tribal people. Nothing fruitful came out of the efforts of the delegation.

On 15 February, 1972, another delegation led by M. N. Larma waited on the Prime Minister with a charter of four point demands, which were :

a. Autonomy for the Chittagong Hill Tracts and the establishment of a special legislative body;

b. Retention of the regulation 1900 in the new constitution of Bangladesh:

3. Continuation of the offices of the tribal chiefs; and

d. A constitutional provision restricting the amendment of the Regulation of 1900 and imposing a ban on Bengali settlement in CHT.

But these demands were deemed potently disruptive and rejected by the Prime Minister, who on the contrary argued in favour of subsuming such parochial ethnic aspirations under a broader nationalism to facilitate national integration.[4] After constitutional Attempts of redressing their grievance failed, M. N. Larma and other tribal leaders prepared to mobilize the tribal people politically and militarily.

---

3 ibid., p.33

4 ibid., p.110

Insurgency

Under these circumstances, Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) was formed on February 15, 1972 with M N Larma as its head. PCJSS demanded autonomy for the Chittagong Hill Tracts. On January 1973, Shanti Bahini (SB), an armed wing was added to PCJSS. Shanti Bahini first began its armed insurgency in the beginning of 1975 by ambushing a police patrol near Subhalong. With the political change-over in mid-1975, the armed insurgency gained momentum. Normal life in the Chittagong Hill Tracts was disrupted by the guerrilla activities of the Shanti Bahini. Shanti Bahini attacked police, BDR and Army patrols and camps, destroyed roads, culverts and bridges and Key installations. Govt. claimed that from 1980 to 1991, 952 Bangalee, 188 tribal were killed and 656 Bangalee, 152, tribal were injured as a result of Shanti Bahini operation. There have also been reports of Bengali reprisals against the tribals as sequence to SB attacks and also alleged violation of human rights by the security forces.[5]

Peace Accord

Successive Bangladesh governments continued counter-insurgency operations and at the same time undertook steps for socio-economic development of the Hill Tracts. From the Ershad regime to the present govt., all opened dialogue with the PCJSS to find politcal solution to the Hill Tracts Problem. At the outset, PCJSS demanded provincial autonomy with legislature. But during its sixth dialogue with the govt. in December 1988, PCJSS modified their demand for provincial autonomy and asked for regional autonomy. However, after extensive negotiation, PCJSS agreed to climb down on their

5 Ibid, p.113

demand for regional autonomy and agreed to accept administrative autonomy in the form of strengthened local govt. On December 2, 1997 an agreement was signed between the govt. of the peoples Republic of Bangladesh and the PCJSS. Janab Abul Hasnat Abdullah, Chief whip, Jatiay Sangsad signed on behalf of Bangladesh govt. and Mr. J. B. Larma signed on behalf of PCJSS.

The agreement has four parts : Ka, Kha,ga and gha. Some major provisions of the agreement have been discussed below :

(ka) General

In clause one, Chittagong Hill Tracts has been recognized as a tribal inhabited region. In clause 2, provision for an implementation committee has been made. Implementation Committee would monitor the implementation process of the agreement.

(Kha) Parbatya Zila parishad.

Both sides agreed to amend the existing Parbatya Zila Sthanio Sarkar Parishad Act, 1989.

Clause two Provides that the name of the district council will be amended, from Parbatya Zila Sthanio Sarkar Parishad to Parbatya Zila Parishad.

Clause three provides the definition of non-tribal permanent resident'. Non-tribal permanent resident will mean those who are not tribals but have legally obtained lands and generally live in hill districts at specific addresses.

Clause four (ga) provides that the words 'Deputy Commissioner' and 'Deputy Commissioners' in the second line of sub-section(5) of section 4 will be replaced by the words "circle chief" and "circle chiefs". Through this amendment,

Deputy Commissioner's power to determine who is a tribal and who is not, has been curtailed and the power has been vested in the circle chief.

Sub-clause gha provides that the concerned circle chief will ditermine whether a person is non-tribal or not on the basis of certificate given by concerned mouza headman/union parishad chairman/pourashava chairman.

Clause seven amends section ten of the act and extend the tenure of the parbatya zila parishad from 3 to 5 years.

Clause eight provides that if the post of the chairman falls vacant or in the absence of the chairman, a tribal member will be elected by other members of the parishad to chair meeting of the parishad and discharge other responsibilities. This clause curtails the power of the govt. and provides for more democratization of the parishad.

Clause nine provides that only a permanent resident of the hill district will be eligible to be included in the voter list. This clause tries to protect the interest of the tribals.

Clause 18 proposes to delete section 38(3) and amend section 38(4). This clause removes the power of the govt. to revise the budget. Certainly it strengthens the parishad.

Clause 19 provide that the parishad can formulate, adopt and implement development projects with the money received from the govt. on the transferred subjects. All national level development programmes will be implemented through the parishad by the concerned Ministry/Division/Organization.

Clause 21 says that the sections 50,51 and 52 of the Parbatya Zila Sthanio Sarker Parishad Act, 1989 will be repealed. Section 50 is concerned with the supervision of the parishad

by the govt. Section 51 is concerned with the control over the activities of the parishad by govt. and section 52 is concerned about inquiry into the affairs of the parishad by the govt. In lieu of the above sections, a new section will be enacted. The new section will empower the govt. to give advice or issue directives to the parishad so that its activities are consistent with the purpose of the Parbatya Zila Parishad Act. This amendment will reduce the interference of the govt. in the affairs of the parishad and thereby strengthen it.

Clause 22 Provides that if the govt. abrogates the parishad than it will have to be reconstituted within ninety days. It lessens the discretionary power of the govt. and strengthens democratization.

Clause 26 provides for amendment of section 64 of the Act. The new section will provide that no land including khas land can be leased out, settled, purchased, sold or transferred without the prior permission of the Parishad. Besides, the parishad will control and supervise the activities of Assistant commissioner (Land), his staff, and mouza headman.

Clause 33 Provides that supervision of law and order, vocational training, primary education through mother tongue, secondary education will be within the charter of duties of the parishad.

Clause 34 Provides that another 12 entries will be made in the charter of duties of the parishad. These includes land and land management, Police (local) etc.

(ga) Chittagong Hill Tracts Regional Council.

This part Provides for the establishment of chittagong Hill Tracts Regional Council combining the three Zila Parishads. The Regional Council will have a chairman and 21 other members. All the development activities of the three zila

parishads will be co-ordinated by the council including overall supervision and co-ordination of the matters under their jurisdiction. Regional council will also supervise and coordinate local councils including municipalities.

(gha) Rehabilitation, general amnesty and other matters.

Clause one Provides that rehabilitation of tribal refugees from Tripura will continue.

Clause four Provides that a land Commission will be constituted for disposal of disputes relating to land.

Clause 12 Provides that PCJSS will submit the list of all its members including armed members and statement of arms and ammunitions under its control and possession to the govt. within 45 days of the signing of the agreement.

Clause 13 Provides that govt. and PCJSS will jointly decide tha date and place of depositing arms and ammunitions by the PCJSS members.

Clause 14 Provides that govt. will declare amnesty to those members of PCJSS who will deposit arms and ammunitions.

Clause 17 Provides that excepting BDR camps and 6 army Cantonments, all temporary camps of Army, Ansar and VDP will be withdrawn.

Clause 18 Provides that all the positions of employees of Govt. semi-Govt., and autonomous bodies will be filled by the permanent residents of Chittagong Hill Tracts with priority for the tribals.

Clause 19 Provides that a Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs will be established. A tribal will be appointed minister of that ministry. An advisory committee will be formed to assist the ministry.

Implementation process of the Peace Accord

As per the peace accord, PCJSS leadership deposited its arms and ammunitions to the government. Government, on its part, granted amnesty to those members of the PCJSS who deposited their arms and ammunitions. To rehabilitate the internally displaced persons, a task force was constituted with Dipankar Talukdar M P as its chairman. Some army camps were withdrawn. Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs was created and Kalpa Ranjan Chakma MP was given charge of that ministry. A Land Commission has been constituted.

Local Govt. Parishad Acts 19, 20, and 21 of 1989 were amended through Acts 9, 10 and 11 of 1998. Amendment changed the name of the Parishad from Hill Tracts District Local Govt. Parishad to Parbattya Zila Prishad and strengthened the Parishad by reducing the scope of govt. interference. Besides, more functions had been assigned to the Parishad, some of which, e.g., vocational education, primary education, secondary education, police, land management are really important in administrative and development context. Sources of income of the Parishad had been raised. Some new sources like royalty on forest and mineral resources, sales tax, holding tax, land development tax, supplementary tax on cinema, tax on trade would help the Parishad to stand on more sound financial footing.

Parbattya Chattagram Anchalik Parishad Act, 1998 was enacted. This Act provided for a regional council in the Chittagong Hill Tracts comprising the three hill districts. For the interim regional council, J. B. Larma was nominated chairman by the govt. Twenty-one members of the regional council were also nominated by govt. J. B. Larma did not

accept the offer of the chairmanship of the council immediately. He accused the govt. of not fulfilling all the provisions of the peace accord. He specifically complained about clause 19, part kha of the accord where it had been mentioned that all the national development programmes in the Hill Tracts would be implemented through the Parbattya Zila Parishad. Acts 9, 10 and 11 of 1998 did not fulfill this clause. He also complained about the inclusion of three non-tribal members in the interim regional council as they were included without P C J S S's consent. After dialogue with the Minister for Chittagong Hill Tracts Affairs, Kalpa Ranjan Chakma, J. B. Larma agreed to take over the responsibility of the chairmanship of the regional council. Regional Council under the Chiarmanship of J. B. Larma, formally started functioning on May 27, 1999. It is undoubtedly an important step in the implementation of the peace process.

P C J S S leaders are now demanding immediate resolution of the tribal refugee problem. They are also demanding immediate withdrawal of army camps from the Hill Tracts and release of PCJSS prisoners. They are complaining that a group is trying to create disturbances in the Hill Tracts by opposing the peace accord and demanding complete autonomy. A faction of the administration and intellectuals are helping them. According to them, the task force for the rehabilitation of the tribal displaced persons is not doing its job and govt. has not taken any effective step to rehabilitate the tribal refugees (who returned from India) during the last one year. Many non-tribal people are still entering the Hill Tracts.[6]

---

6 Daily Prothom Alo. Dhaka. May 23. 1999

Opposition to the peace accord

Major opposition parties, i. e., Bangladesh Nationalist Party (BNP), Jatiya Party (JP), Jamate Islami are opposing the peace accord. They assert that it contravenes the constitution. But, interestingly, none has yet filed a writ before the Supreme Court, challenging the accord. BNP had called strikes and organized Long March to oppose the accord. BNP, Jamat and JP has observed May 27,1999 as black day to protest the installation of the Regional Council on that day. Parbattya Gana Parishad, an organization of the Bengalis in the Hill Tracts, has observed strike in the Chittagong Hill Tracts, on that day.

Among the tribals Pahari Chhatra Parishad (Prasit-Shanchaya faction), Pahari Gano Parishad, Hill Women Federation and a newly formed political organization, United Peoples Democratic Front is opposing the peace accord. On April 22, 1999, a planned public rally of anti-peace accord tribesmen at Khagrachhari could not be held due to govt. Prohibition. In the ensuing clashes, two persons were killed and 150 others were injured in police firing. Clashes also broke out at Dighinala and Laxmichhari between Pahari Gano Parishad, Hill Women Federation activists and PCJSS activists and police.[7] On May 24, 1999, two cocktails were thrown on the motorcade of J. B. Larma on his way to Rangamati from khagrachhari. Though J. B. Larma escaped unhurt, the incident must be viewed seriously. Because it shows a new turn of events.

Conclusion

Hill Tracts peace agreement is in the implementation process now. It is inevitable that many difficulties will crop up at this

7 The Daily Star, Dhaka, April 23, 1999

stage. The nation hopes that all the difficulties will be resolved by dialogue between the govt. and PCJSS. The country badly needs peace for economic emancipation of the people and for the development of the Hill Tracts region.

Bibliography

Ahmed, Emajuddin...Shanti Chuki Abang Annanya Prabandha Info publications. Dhaka, 1998.

Bessaignet. Prof. Pierre.......Tribesmen of the Chittagong Daily Prothom Alo, Dhaka, May 23. 1999.

Hill Tracts; Asiatic Society of Bangladesh, Publication No. 1, Dacca, 1958.

Ishaq, Mohammed (ed)....Bangladesh District Gazetteers : Chittagong Hill Tracts, B. G. Press, Dacca, 1975.

Lewin, Capt T. H.......The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein, (1869).

Safa, Ahmed....Shanti Chukti O Nirbachita Nibandha, Info Publications, Dhaka, 1998.

Sattar Abdus.....Arranya Janapade, Dhaka,1966.

Shelly, M. R. (ed.)..The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh : The Untold Story, Centre for Development Research, Bangladesh, 1992.

Statistical pocket Book of Bangladesh 1997, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, 1998.

The Daily Star, Dhaka, April 23. 1999.

লেখকের প্রতি জ্ঞাতব্য

- ✡ লোক প্রশাসন সাময়িকীতে লোক প্রশাসন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, পরিবেশ, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশের ঘটনাবলী, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণাধর্মী, বিশ্লেষণমূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হয়।
- ✡ রিপোর্ট সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় টাইপকৃত লেখা/প্রবন্ধ মূলকপিসহ মোট ৩ (তিন) কপি সম্পাদক, লোক প্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।
- ✡ লেখা/প্রবন্ধ ৬,০০০ শব্দ (মুদ্রিত ২০ পৃষ্ঠা) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়।
- ✡ পূর্বে অন্য কোন পত্রিকায়/গ্রন্থে প্রকাশিত লেখা মনোনীত হবে না।
- ✡ লেখা মনোনয়নের এবং পরিমার্জন/অংশবিশেষ বাতিল করার পূর্ণ অধিকার সম্পাদনা পরিষদের রয়েছে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না।
- ✡ মুদ্রিত প্রতি পৃষ্ঠার (৩০০শব্দ) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

বিপিএটিসির প্রকাশনা বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য
কেন্দ্রস্থ অনুষদ ভবন-২, এর ৩য় তলায় প্রকাশনা শাখার দপ্তরে তালিকাভুক্ত বই, পুস্তক ও জার্নাল পাওয়া যায়।
কেন্দ্র থেকে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বই, পুস্তক ও জার্নালের বিক্রয় মূল্যের উপর সাধারণত ৫০% কমিশন দেয়া হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রকাশিত পুস্তক/পত্রিকা ও মূল্য তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম ও লেখক	প্রতি কপির দাম	কমিশনসহ প্রতি কপির দাম
1.	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
2.	বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন জার্নাল	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
3.	লোক প্রশাসন সাময়িকী	১৫/০০	টাকা ঃ ৭/৫০
4.	Post-entry Training in Bangladesh Civil Service: The Challenge & Response	40/00	Tk. 20/00
5.	Career Planning in Bangladesh	120/00	Tk. 60/00
6.	Co-ordination in Public Administration in Bangladesh	100/00	Tk. 50/00
7.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা	১২০/০০	টাকা ঃ ৬০/০০
8.	Sustainability of Project For Higher Agricualtural Education	40/00	Tk. 20/00
9.	Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Ganoshasthaya Kendra	40/00	Tk. 20/00
10.	Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of Rural Development Project In Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
11.	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
12.	Handbook for the Magistrates	100/00	Tk. 50/00
13.	A Study of the use of Computer	50/00	Tk. 25/00
14.	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি	125/00	Tk. 62/50